নীচের তলায়

প্রবোধকুমার সান্যাল

নীচের তলায়

(এই গ্রন্থের রচনাকাল জুন ও জুলাই, ১৯৪৭)

দাম আড়াই টাকা

শিল্পী—শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী

প্রাপ্তিস্থান : মিত্র ও ঘোষ : শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা : ১২

পি. কে. বসু এণ্ড কোম্পানি, কলিকাতা-৩১, হইতে প্রফুল্লকুমার বসু কর্তৃক
প্রকাশিত এবং কালিকা প্রেস লিঃ, ২৫নং ডি. এল রায় স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬, হইতে শশধর চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

বড়খুকুকে

প্রবোধকুমার সান্যালের

অন্যান্য বই

প্রবোধকুমারের শ্রেষ্ঠ গল্প

জলকল্লোল

মল্লিকা

যতদূর যাই

আলো আর আগুন

লাল রং

বন্যাসঙ্গিনী

আগ্নেয়গিরি

চেনা ও জানা

অঙ্গরাগ

পঞ্চতীর্থ

নদ ও নদী

অরণ্যপথ

অঙ্গার

দেবীর দেশে মেয়ে

দেশ দেশান্তর

স্বাগতম্

এই যুদ্ধ

মহাপ্রস্থানের পথে

ছোটদের মহাপ্রস্থানের পথে

পায়ে-হাঁটা পথ

ভ্রমণ ও কাহিনী

মনে মনে

আঁকাবাঁকা

শ্যামলীর স্বপ্ন

বন্দী বিহঙ্গ

—ইত্যাদি—

নীচের তলায়

কোনো সংবাদ কোনোদিন যেখানে পৌঁছবে না—এই দেশেই এমন একটি ছোট্ট স্বর্গ খুঁজে পাওয়া দরকার। মাধবচন্দ্র এজন্য লোক পাঠিয়েছিলেন নানা দিকে। যারা খোঁজ করতে গিয়েছে, তারা সকলেই একাজে বিরক্ত, কেউ খুশি নয়। তারা জানে, এ হোলো জমিদারবাবুর একটা নতুন খেয়াল; এ খেয়াল তাঁর হয়ত বেশি দিন থাকবে না, মাঝ থেকে কাছারি-সেরেস্তার লোকের একটা অহেতুক হায়রানি। কিন্তু উপায় নেই, কর্তাবাবুর বিশেষ অনুরোধ, এ খেয়াল তাঁর চরিতার্থ করাই চাই। তাঁর একেবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ।

কোনো সংবাদ পৌঁছবে না, এমন একটি স্থান—এ প্রস্তাবের কি তাৎপর্য? কি প্রকার সংবাদ? সংবাদ বলতে তিনি কি বোঝেন?—নানাবিধ কৌতূহল নিয়ে পুরাতন বন্ধু বৈকুণ্ঠবাবু মাধবচন্দ্রের বৈঠকখানায় এসে হাজির হলেন। সামনে রুপোর পানের ডিবে—তার সঙ্গে স্মৃর্তি জর্দা ও কিমাম রয়েছে নানা পাত্রে, এ পাশে রুপোর গড়গড়ায় সুগন্ধ অম্বরী তামাক পুড়ছে, মাথার উপরে মৃদুগতি পাখা ঘুরছে, এবং ফরাসের ঠিক মাঝখানে ব'সে মাধবচন্দ্র তাঁর প্রিয় কাব্য শকুন্তলার নূতন ব্যাখ্যা রচনায় ব্যস্ত। লেখাপড়ার বিচিত্র ও বিবিধ সরঞ্জাম চারিদিকে সাজানো।

বৈকুণ্ঠবাবু কাছাকাছি গিয়ে বসলেন। মাধবচন্দ্র একটু হেসে চশমাখানা খুলে বললেন, টেলিফোনে কথা হয় না, তাই তোমাকে ডেকেছিলুম।

বৈকুণ্ঠ বললেন, তোমার নতুন হুজুগের চেহারাটা কি প্রকার, শুনি ?

মাধব বললেন, খুব সহজ এবং সাবলীল।

যথা ?

মাধবচন্দ্র বললেন, শোনো—আমি সেইখানে যাবো যেখানে খবরের কাগজ, রেডিয়ো, হুজুগে লোক, ভগ্নদূত—ইত্যাদি এসব কিছু নেই। শহরের কোনো দাগ যেখানে নেই, শহরের হাওয়া যেখানে পৌছয় না।

বৈকুণ্ঠ বেশ গুছিয়ে ব'সে বললেন, কণ্বমুনির আশ্রম এ যুগে তুমি পাবে কোথা ?

মাধব বললেন, ভদ্রমনকে বাঁচাবার মতো জায়গা এখনো নিশ্চয়ই খুঁজলে পাওয়া যায়, বৈকুণ্ঠ।

বৈকুণ্ঠ বললেন, তুমি যদি সুন্দরবনের জঙ্গলে গিয়ে বাস করো, সেখানেও মৌচাক কেনবার জন্যে শহুরে দালালরা ঘোরে। কিন্তু হঠাৎ তোমার এই বানপ্রস্থী ভাব কেন বলো দিকি ? আইবুড়ো থেকে জীবনটা বেশ কাটিয়ে দিলে, কিন্তু খেয়াল-মর্জি কই কাটলো না ত ? সহজে যা বোঝালে, সহজে কি তাই পেরে উঠবে ?

শোনো বৈকুণ্ঠ—মাধবচন্দ্র বললেন, আমাকে ভাই যেতেই হবে। সেই মনের মতন জায়গা খুঁজে না পেলে আমার চলবে না। দেখতে পাচ্ছ আমার কত কাজ ? এর পর আসবে মহাভারত আর রামায়ণ সম্পাদনের কাজ, এদিকে বাংলার

ইতিহাস সবে আরম্ভ করেছি, শঙ্কর আর বুদ্ধের কিছু তুলনামূলক আলোচনা,—কাজের শেষ নেই আমার।

বৈকুণ্ঠ বললেন, দিনকালের চেহারা ভালো নয়,—এ সময় হঠাৎ যাবেই বা কোথায়। স্বর্গলাভ ছাড়া আর কোনো লাভের জায়গা চোখে পড়ে না।

মাধব বললেন, তা সে যেখানেই হোক, কিন্তু এখানে আর নয়। কোনো খবর পাবো না, কেউ জানবে না, কোনো ঢেউ গিয়ে পৌঁছবে না—এমন জায়গা আমাকে খুঁজে পেতেই হবে।

এত অরুচি তোমার হোলো কিজন্যে বলো ত?

মাধব বললেন, মানুষে অরুচি নেই যদি মানুষ হয় তারা। পৃথিবীতে আর বৈচিত্র্য নেই, নতুনত্ব আরো কম। যা কিছু খবর, সবই দুর্ভাবনার সবই আশঙ্কার। হত্যায় বাহাদুরি, প্রতারণায় গৌরব, চাতুরীতে জয়ধ্বনি,—এরই তলায় ইতিহাস আর সভ্যতার সেই আদি ঘটনা,—মানবতার অপমান আর মানবাত্মার উৎপীড়ন। পৃথিবী তার সমস্ত মহিমা হারিয়ে ফেলেছে। সেই খবর বার বার কানে তোলবার জন্যে শহরে না ব'সে থাকলেও চলবে। আমাকে চ'লে যেতেই হবে, বৈকুণ্ঠ।

বৈকুণ্ঠ বললেন, কোথায় যাবে ঠিক করেছ?

মাধব বললেন, মন ঠিক হয়েছে, স্থান এখনো ঠিক হয়নি।

কতদিনের জন্যে যাবে?

চিরদিনের জন্যে! মানে, যে-ক'টা দিন আর বাঁচবো।

বক্রকটাক্ষে বৈকুণ্ঠ তাঁর পুরনো বন্ধুর মুখের দিকে একবার

বেশ ভালো ক'রে তাকালেন। তারপর ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, যাই, আমার অনেক কাজ। প্রলাপ আর বিলাপ শোনবার বয়স আমার আর নেই। যেখানেই যাও দু'লাইন চিঠি লিখে জানিয়ো কবে ফিরছো।

মাধব বললেন, যেখানে যাবো, সে-অঞ্চলে আর যাই থাক্ ডাকঘর একটিও থাকবে না।

বৈকুণ্ঠ দু'পা বাড়িয়ে হাসলেন, ভীমরতি শব্দটা যাবার সময় আর ব্যবহার করবো না। দুষ্টা সরস্বতী তোমাকে সৎপথে চালিত করুন!

বৈকুণ্ঠবাবু আর বাক্যব্যয় না ক'রে সোজা বেরিয়ে গেলেন।

সহস্র বন্ধনে মাধবচন্দ্র এ বাড়িতে বাঁধা। জমিদারি আছে উত্তরবঙ্গে নানা অঞ্চলে, অনেকবার তিনি গিয়েছেন দেশগাঁয়ে, অনেক তালুক তাঁদের খাস থেকে বেরিয়ে গেছে এক এক কালে, —আদায় তহশীল কখনো বেড়েছে, কখনো বা কমেছে,—কিন্তু শহরের এই প্রাচীন অট্টালিকায় তাঁদের কাটলো তিন পুরুষেরও বেশি। তিনি সংসার করেননি, কিন্তু তার জন্য কী এসে গেল। তাঁর অংশটা এখনো প্রায় অক্ষুণ্ণই আছে। তাঁর অংশে আছেন গৃহদেবতা, মাসোহারার কতকগুলি লোক, কতক বাধ্যবাধকতা, তাঁর ছবি আঁকার বাতিক, তামাকের নেশা, পানের সরঞ্জাম, তাঁর গাড়িচড়ার অভ্যাস, সিনেমা-থিয়েটারের হুজুগ, ফাট্‌কা

বাজার আর ঘোড়দৌড়ের মাঠ,—এবং সকলের আড়ালে তাঁর নিরিবিলি সাহিত্যচর্চা। তিনি এ পল্লীর সেবাসমিতির সভাপতি, কয়েকটি ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষক, বীমা কোম্পানির পরিচালক, সঙ্গীত-সঙ্ঘের তত্ত্বাবধায়ক, এবং সাহিত্য-মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। সুতরাং এতগুলি বন্ধন থেকে মুক্তি নিয়ে তিনি নিরুদ্দেশ হবেন, এবং আর তিনি ফিরবেন না, তাঁর এই প্রলাপোক্তি অনেকের কাছে বাস্তবিকই হাস্যকর।

দিন আষ্টেক পরে তাঁর লোকজন ফিরে এসে জানালো, তাঁর ফরমাসমতো কোনো নিরিবিলি জায়গা খুঁজে পাওয়া বিশেষ কষ্টকর। মাধবচন্দ্র তাঁদের দিকে চেয়ে বললেন, তোমরা খুঁজে পেলে না, কিন্তু আমি এখানে ব'সেই আমার জায়গা স্থির করে ফেলেছি।

ছোটবাবু বললেন, কোথায়, কর্তামশাই ?

ডোমজুড়িতেই আমি যাবো। আমাদের খাসে ওর দক্ষিণ অংশটা ছিল না ?

আজ্ঞে, সে আর এখন নেই। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কি, বলো ?

ওটা আর ব্বাসের যুগ্যি নেই, কর্তামশাই। খানিকটা নদীতে ভেঙে নিয়ে গেছে, বাকিটা গেছে সেবারের মড়কে পরিষ্কার হয়ে।

ভিটেটুকুও গেছে ?

একটুখানি চিহ্ন আছে তার এখনো। কিন্তু সেখানে পুরনো

নীলকুঠির যত সাপখোপের আড্ডা। তা ছাড়া ওদিকটা আজকাল ডাকাতের ডাঙা। কাছাকাছি বসতি কোথাও নেই, কর্তামশাই।

মাধবচন্দ্র কিছুক্ষণ কি যেন ভেবে সহসা একটু হাসলেন। পরে বললেন, হরিপদ, আমি ডোমজুড়িতেই যাবো ঠিক করেছি। তোমরা এদিকের ব্যবস্থা করো।

হরিপদ বললে, কর্তামশাই, ওখানে পত্তনি দেবার পর আর এক ছটাকও জমি নেই কিন্তু।

মাধব বললেন, একলা থাকার মতো একটুকরো মাটি ঠিকই পাবো, হরিপদ।

মাপ করবেন, কর্তামশাই, তাদের দয়াতে আপনি থাকতে যাবেন কেন? তারা চিরকাল আপনাদের গোলাম।

অভিমান কিছু না নিয়েই যাবো, হরিপদ। তোমরা ব্যবস্থা করো।

খেয়াল বটে, কিন্তু খেয়ালটা অনন্যসাধারণ সন্দেহ নেই। সেই দিনই জনতিনেক লোক ডোমজুড়ির উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। মাধবচন্দ্র সমারোহ ভালোবাসেন না। উপকরণ-বাহুল্যকে বর্জন ক'রে নিতান্ত দরকারী জিনিসপত্রগুলিই তিনি সঙ্গে নিলেন। তাঁর অনুচরেরা যাতে তাঁর জন্য অসুবিধা ভোগ না করে সেদিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল। তিনি নিজে বিবিধ

সামগ্রী পরিত্যাগ করলেও তাঁর সঙ্গীরা তাঁর সুখসুবিধার দিকে নজর রেখে যথাসম্ভব আসবাবসজ্জা ও জিনিসপত্র গুছিয়ে বাক্সবন্দি করলো। সকলেই বিশ্বাস করে, তাঁর এই হুজুগ অল্পদিনেই কেটে য়াবে, যথাকালে আবার হাসিমুখেই তিনি ফিরে আসবেন। তাঁর উৎসাহের সামনে এখন কোনো প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ একেবারেই নিস্ফল। মাধবচন্দ্রের এই পরিবর্তনের মধ্যে কেমন একটি আকস্মিকতা ছিল ; তিনি অন্যমনস্ক মনে এবং একটি নিস্পৃহ গাম্ভীর্যের সঙ্গে সকলের কাছে একে একে বিদায় নিয়ে সুদূরবর্তী গ্রামের দিকে যাত্রা করলেন। যেন একটি কঠিন প্রতিজ্ঞা তাঁকে কিছুকাল থেকে পেয়ে বসেছে। তিনি পিছন ফিরে আর তাকালেন না।

মাঝখানে দু'বার রেলগাড়ির বদল ছিল, তারপর হোলো গোযানে অভিযান, তারপরে পাওয়া গেল মস্ত নদী,—সেই নদী ধ'রে বজরায় কয়েক ঘণ্টা ভাসতে ভাসতে গেলে তবে ডোমজুড়ির হাট। ডোমজুড়ির হাটে আজকাল আর হাট বসে না, তবে আশ্বিনের শেষে জলকাদা কিছু শুকোলে তবে এক আধজন ফড়ে এবং দু'চারজন হেটুরেকে দেখতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি কিছু-দিন এ অঞ্চলে একটা পাটের কেন্দ্র খোলার পর থেকে দু'চারজন মাড়োয়ারি এবং অবাঙালী অধ্যবসায়ীর আনাগোনা চলছে। তারা আসবার সময় নিজেদের সঙ্গে এমন কতকগুলি জিনিস আনে যেগুলি চাষী মহলে খুবই প্রিয়—যেমন চা, তামাক, চিনি, কেরোসিন, রঙিন কাপড় ইত্যাদি।

কিন্তু এই হাটতলা থেকেও ক্রোশদেড়েক দূরে মাধবচন্দ্র তাঁর দলবল নিয়ে তাঁবু ফেললেন। অদূরে এক প্রাচীন জরাজীর্ণ ভিটে, অনেককাল আগে এখানে সাহেবদের নীলকুঠি ছিল। দু'খানা পুরনো ইমারতের ঘর এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে—কিন্তু জন্তু আর সরীসৃপের কবল থেকে তাকে আপাতত মুক্ত করা কঠিন। এপাশে অনেককাল আগে তাঁদেরই এক নায়েবের জন্য দু'খানা কাঁচাঘর তৈরি ছিল, কিন্তু একখানায় করোগেট নেই, অন্য খানায় দরজা জানলা সবই খুলে নিয়ে গেছে, আছে কেবল কাঠামোটা। বারম্বার বর্ষার আঘাতে তাও মাটি ভাঙাচোরা। মাধবচন্দ্রের জন্য এই কাঁচাঘর দু'খানাই স্থির করা হোলো।

মনে মনে সকলেই বিশ্বাস করেন, মাধবচন্দ্র এখানে বেশিদিন নয়। সেজন্য তাঁর সহচররা এ অঞ্চলে জমিদারের অভ্যাগমন নিয়ে গ্রামাঞ্চলে বিশেষ সোরগোল তোলেনি। কিন্তু মাধবচন্দ্র এই ঘর দু'টিতেই এরূপ ব্যবস্থাদি ক'রে নিলেন যাতে একথা বিশ্বাস করা যায় যে, তিনি স্থায়ী-ভাবেই এখানে বসবাস করবেন। জীবনের যে অংশটা উপকরণবহুল সেটাকে তিনি ব'লে থাকেন নাগরিক জীবন,—সেটার সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার একটা বিশেষ মনোবৃত্তি জড়ানো,—সেই জীবনটাকে তিনি নগরের অট্টালিকাতেই ফেলে এসেছেন। সুতরাং এখানে এসেছেন তিনি নতুন হয়ে ; এখানকার জলমাটি আর পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেবার জন্য অন্তরের যে স্বভাব-বৈরাগ্যের

দরকার সেটিকে তিনি বহুকাল আগে থেকেই মনে মনে লালন করেছেন। সেইজন্য অনুচরদের মধ্যে যতই উদ্বেগ ও দুর্ভাবনা থাকুক না কেন, তিনি নিজে স্বচ্ছন্দ জীবনের চেহারাই দেখতে পেয়েছেন। কোনো নালিশ এবং কোনো অভাব তিনি বোধ করছেন না।

নব্যপরিবেশের মাঝখানে তাঁর কাজের কোনো খর্বতা ঘটেনি, তাঁর লেখাপড়ার কাজ প্রত্যেকদিন সমান মাত্রার সঙ্গেই চলেছে। কয়েকদিন পরে তাঁর চাকর পরিতোষ এসে সকালের দিকে জানালো, কর্তামশাই, আপনার চা নৈলে একবেলাও চলে না, কিন্তু এখানে দুধ চিনি কোনোটাই জোগাড় করতে পারছিনে।

হাসিমুখে মাধবচন্দ্র বললেন, চা নৈলে আমার একবেলাও চলে না, একথা তোকে কে বলেছে? ওরা কোথায়?

ওরা গেছে ডোমজুড়ির হাটে, যদি জিনিসপত্র কিছু পাওয়া যায়।

মাধবচন্দ্র একবারটি বইকাগজের দিকে মনোযোগ দিয়ে পরে মুখ তুলে বললেন, চা আর আমাকে দিবিনে।

তাঁর কণ্ঠস্বরে কতকটা কাঠিন্য ছিল, সেজন্য পরিতোষ আর কিছু বলতে সাহস করলো না। চায়ের নিত্য অভ্যাস কর্তার পক্ষে ত্যাগ করা যে কত কঠিন, সেকথা পরিতোষ মনে মনে উপলব্ধি ক'রে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে তিনি পান খাওয়া ছেড়েছিলেন, কেননা পান এখানে পাওয়া যায় না, দ্বিতীয়ত সুপারি ও চূণ কিনতে হয় মাড়োয়ারিদের কাছে

অগ্নিমূল্যে। সে-মূল্য অরাজক দেশেরই যোগ্য। পরিতোষ আর হরিপদরা হাটে গিয়ে জমিদারের নামে ফড়েদের এক আধবার হুমকি দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মেড়োরা চাষীদেরকে উসকিয়ে এমন দৃশ্যের অবতারণা করলো যে, ওদের সেদিন হাট থেকে খালি হাতেই ফিরে আসতে হোলো।

মাস তিনেকের মধ্যেই যে অবস্থাটা দাঁড়ালো তাতে আর যাই থাক্ জমিদারের আভিজাত্য নেই। এদেশে সাবান অথবা ক্ষার দুটোই দুষ্প্রাপ্য, গৃহসজ্জা ও পরিচ্ছদকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য যে সকল সামগ্রী আগে পাওয়া যেতো—সে বছর মড়কের পর থেকে অদ্যাবধি আর কিছুই পাওয়া যায় না। আহার্য বস্তু যা পাওয়া যাচ্ছে, তা কেবল চাষীজগতের মধ্যেই পরিচিত, সভ্যসমাজের সঙ্গে তার কোনো পরিচয় নেই। কারাবাসী চোর ডাকাতের খাদ্যতালিকা এদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত, এ সংবাদ মাধবচন্দ্র জানেন। হরিপদ অথবা পরিতোষ পাগলের মতো দিবারাত্র ঘুরে বেড়িয়েও এই প্রকার জীবনযাত্রার কোনো প্রতিকার করতে সমর্থ হয়নি। আট দশ মাইলের মধ্যে কোথাও ডাকঘর নেই যে, কলকাতায় খবর পাঠানো যাবে। তাছাড়া মাধবচন্দ্রের কঠোর নির্দ্দেশ ছিল—ডাকঘরে কারো যাওয়া চলবে না। টাকাকড়ি ওদের কাছে যা ছিল, গত তিন মাসে সমস্তই খরচ হয়ে গেছে। তারা অনুমান করেছিল, কর্তামশাই বেশ কিছু টাকা সঙ্গে এনেছেন, কিন্তু কি যেন একটা ব্যাপারে জানা গেছে, তিনি একেবারেই নিঃস্ব। যে ক'টা বাক্স তিনি

এনেছেন তাদের ভিতরে জামাকাপড়ের পরিমাণ যেমনই কম, বই কাগজ তত বেশি পরিমাণেই ঠাসা।

হরিপদ সকালে গিয়ে দুধ আনে অনেকদূর থেকে, কেননা সম্প্রতি দুধের একটা সন্ধান পাওয়া গেছে। পাশে একটা গ্রামে কয়েকটা কলার ঝাড় আছে, কিন্তু এবছরে তেমন ফলন হয়নি। তবু কয়েকদিন কয়েকটা সবুরি-কলা পাওয়া গিয়েছিল। হরিপদরা জাতিতে ঘরামি, ডোমজুড়ির ওদিকে এক মাড়োয়ারির গুদাম তৈরির কাজে সে লেগেছিল, তাতে কিছু সে রোজগার করে এনেছে। পরিতোষ লেগেছিল কয়েকদিন ধানকাটার কাজে। আসল কথা, তারা দু'জন মাধবচন্দ্রের চিরকালের অনুগত লোক। কর্তামশাইয়ের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ত্যাগস্বীকার ও পরিশ্রম করতে তাদের এতটুকু কুণ্ঠা নেই। কিন্তু মাধবচন্দ্রের এই বন্যজীবনের নেশা আরো কতদিনে কাটবে এই ভেবেই তারা আকুল। অথচ মাধবচন্দ্রের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ বড় কম। সম্প্রতি তিনি শকুন্তলা কাব্যের নতুন ব্যাখ্যাটি প্রস্তুত ক'রে রামায়ণের কাজে লেগেছেন। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটির দিকে তাঁর এখন মনোযোগ দেবার সময় নেই। তাঁর অন্ন জুটছে কোথা থেকে, রাত্রে তাঁর বিছানার ওপর মশারি টাঙানো হয় কিনা, তাঁর গড়গড়ার তামাক সংগ্রহের জন্য পরিতোষ কোন্ কোন্ গ্রামে হানা দেয়, শাকসব্জি এবং ফলমূলাদির জন্য হরিপদ কি প্রকার হায়রান হয়—এসব তথ্য জানবার জন্য তিনি একেবারেই ব্যস্ত নন। তিনি

তাঁর কাব্য এবং সাহিত্য আলোচনায় নতুন আলো দেখতে পেয়েছেন।

হরিপদ একদিন এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালো। চশমা নামিয়ে মুখ তুলে মাধব প্রশ্ন করলেন, তুই কোথায় মারামারি ক'রে এসেছিস রে?

হরিপদ সবিনয়ে বললে, পাট খাটিয়ে নিয়েছে কর্তামশাই, এখন পয়সা দিতে চায় না।

গ্রামের লোকের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছিস?

হুজুর, ওরা ঝগড়াই খুঁজছে। আপনি ওদের চক্ষুশূল। ওরা দিনরাত শাসিয়ে যায় আমাদের এখান থেকে উৎখাত করবে।

অপরাধ?

আমরা নাকি খাসদখলের জন্যে এসেছি।

তুই কি খাজনা আদায়ের চেষ্টা করেছিলি?

একেবারেই না হুজুর। আমরা যে কারো সাতে পাঁচে নেই, এ ওরা বিশ্বাস করে না। গোড়া থেকেই ওরা আমাদের কোনো মতলব ঠাউরেছে। আমি চৌকিদারকে জানিয়েছিলুম, কিন্তু সে ভয়ে কোনো কথাই বলে না।

মাধবচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ কি যেন ভাবলেন। পরে বললেন, তুই এখান থেকে চ'লে যা।

হরিপদ নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। মাধব শান্তকণ্ঠে বললেন, তোরা অনেক করেছিস এই ক'মাস, এইবার তোদের ছুটি।

আমরা গেলে আপনার যে চলবে না, কর্তামশাই!

কে বললে তোকে? এ অহঙ্কার কেন তোর? কিছুদিন তোরা আমাকে চালিয়েছিস, কিছুদিন আমি তোদের কাছে আশ্রয় পেলুম। এবার আমি আমার জায়গা খুঁজে পেয়েছি, তোরা চ'লে যা। মাধব পুনরায় বললেন, শোন্, কলকাতায় গিয়ে কখনো আমাকে কোনো সাহায্য করার চেষ্টা করবিনে। আমার বলবার আগে কেউ যেন আমার কাছে না আসে। এখন আমি ভালোই আছি, তোরা গেলে আরো ভালো থাকবো।

হরিপদ কাঁদোকাঁদো হয়ে বললে, আমাকে মাপ করুন হুজুর। আর কখনো ঝগড়া করবো না কারো সঙ্গে। কিন্তু আপনাকে একলা রেখে আমরা কোথাও যেতে পারবো না।

একলা! মাধবচন্দ্র ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতো হঠাৎ দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠলেন। বললেন, একলা! সিংহ একাই থাকে বনে, আর সব প্রাণী থাকে লক্ষ লক্ষ!—বেশি বকাস্‌নে হরিপদ, পরিতোষকে নিয়ে তোকে আজকেই চ'লে যেতে হবে।

হরিপদ আর কোনো কথা বলতে সাহস পেলো না। ওইখানে হেঁট হয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিয়ে সে স'রে গেল।

এত নিঃসঙ্গতা আছে ব'লেই মাধবের এত আনন্দ। বিকালের দিকে তিনি মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে অথবা পায়চারি ক'রে খানিকটা সময় কাটান। কোনো দ্রুততা এদিকে নেই। দূর মাঠে গোরু হেঁটে যায়, কী মন্থর তার গতি—মাঠ যেন আর

ফুরোয় না। শেয়াল চ'লে যায় নিরুদ্বেগে,—মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকায়। আকাশের সকল প্রান্তে আশ্চর্য স্বাধীনতা,—বাতাসে কোনো নগরের কোনো কোলাহল এসে পৌঁছয় না। এখানে সংবাদপত্র নেই, কোনো অশান্তি আর হানাহানির খবর আসে না; জাতির সঙ্গে জাতির মনোমালিন্য এখানে অজ্ঞাত। মাঠের সঙ্গে আছে সবাই মাটির গায়ে গায়ে লেগে, গাছে-পালায় শস্যে-মানুষে কীট-পতঙ্গে পশু-পক্ষীতে সবাই একাকার,—কারো সঙ্গে কারো কোনো বিরোধ নেই। কেউ স্বতন্ত্র নয়,—চারিদিকের এক বিপুল ঐক্যবন্ধনের ভিতরে কোথাও ছন্দের কোনো ভাঙন নেই। মাধবচন্দ্র কেমন যেন অপরিসীম তৃপ্তি ও পুলক অনুভব করেন। এর বেশি কিছু তিনি চাননি; এর কমে তিনি বাঁচতে রাজি হননি। এদিকে সরকারী শয়তানির কেন্দ্র নেই, তাই সবাই সুখী। ব্যবসায়, কারখানা, ইলেকট্রিক, বহু আত্মকেন্দ্রিক লোকের স্বার্থচক্রের কোনো সুবিধা নেই—সুতরাং এখানকার মৃন্ময় জীবনের আনন্দ অব্যাহত রয়েছে।

যারা দেখেছে মাধবচন্দ্রকে ছ'মাস আগে তারা তাঁকে চিনতে পারবে না। বর্ণের উজ্জ্বলতা তাঁর আর নেই; আরামপ্রিয়তা তাঁকে ঘিরে ছিল বহুকাল এবং এটা তাঁর পুরুষানুক্রমিক, সেটি তাঁর প্রত্যহের জীবনে আর কোনো চিহ্ন রাখেনি। তাঁর কোনো পাদুকা নেই, পরনে জীর্ণমলিন একখানা খাটো ধুতি, কখনো বা একটা জোব্বা, বেশির ভাগ সময় খালি গা—তাঁকে

দেখলেই গত জীবনের প্রেত বলে মনে হবে। পাকা সোনা আগে ছিল চকচকে, এখন আগুনের আঁচে কালিবর্ণ হয়েছে। সুবিধা হোলো এই, মরচে ধরা লোহার সঙ্গে তার পার্থক্য কম। মাধবচন্দ্র এখানকার মাঠের জল-মাটির সঙ্গে মিলে গেছেন।

হরিপদ চলে গেছে। সে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে কলকাতার বাড়িতে পৌঁছে সে কর্তামশাইয়ের সম্পর্কে কোনো অপ্রীতিকর সংবাদ দেবে না। পরিতোষ যেতে চায়নি, সে অনেক কান্নাকাটি করে আরো কয়েকদিনের জন্য থেকে গেছে। সে নাকি খাবার জল আনে, কাপড় কাচে, ঘরদোর ঝাড়ু দেয় এবং কাঠ জ্বালিয়ে এটা-ওটা রান্না করে। এগুলি অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর কাজ, একাজের জন্য তার থেকে যাওয়া একেবারেই বাহুল্য। আসল কথা, কর্তার কাছে সে আবাল্য মানুষ হয়েছে, তার মন মোহগ্রস্ত, সহজে সে কাছছাড়া হতে চায় না।

কিন্তু সেই পরিতোষের অন্তিমকাল যে এইভাবে ঘনিয়ে এসেছে, সেকথা মাধব ঘূণাক্ষরেও কল্পনা করেননি। হরিপদর যাবার দিন আষ্টেক পরেই বেচারা নামা-ওঠা রোগে সহসা আক্রান্ত হয়, এবং কোনো প্রকার ঔষধপত্র ও চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা করার আগেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে মারা যায়। এই শোকাবহ ঘটনাটি ঘটে ঠিক সন্ধ্যার পরে। পরিতোষের মৃতদেহ সামনে নিয়ে মাধবচন্দ্র শান্তভাবে অপেক্ষা করেন। রাত্রি অতিক্রম না করলে মৃতের সৎকার কোনোপ্রকারেই সম্ভব নয়।

পুরাকাহিনীতে দেখা যায়, মানবতা ও সংস্কৃতির যজ্ঞ পণ্ড করার জন্য যুগে যুগে দুষ্ট শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। মৃত্যু, বিপ্লব, মন্বন্তর এবং অসৎশক্তির চক্রান্ত প্রগতিকে বার বার ব্যাহত করার চেষ্টা করে। মাধব একথা জানেন। কিন্তু তাঁকে সব খোয়াতে হবে এও ঠিক। তাঁর সাধনা হোলো সর্বস্বান্তের সাধনা, তাঁর পথ হোলো সর্বহারার। লোকযাত্রার কৃত্রিম চেহারাটা তাঁর জানা আছে; জীবনের কদর্য বিকৃতি, ভয়াবহ অপচয়—সে অভিজ্ঞতাও তাঁর নতুন নয়। হরিপদ পরিতোষ এরা তাঁর সর্বাপেক্ষা আপন, কেননা এদের ভিতর দিয়ে মানুষকে তিনি পান, আদর্শের দিকটা তাঁর চোখে পড়ে, মানবতার রূপটিকে প্রত্যক্ষ করেন। এরা সাধারণ কিন্তু এরাই অসামান্য। এরা জীবনকে সুন্দর করে, বিশ্বাসের বনিঁয়াদকে নির্মাণ করে, প্রাণকে আনন্দিত করে তোলে।

মৃতদেহটাকে কোনোমতে চাপা দিয়ে রেখে তিনি ভিতরে এলেন। দূরের গ্রাম থেকে আজ সকালে পরিতোষ কেরোসিন আনতে পেরেছিল কিনা তিনি জানতে পারেননি। এ অন্ধকারে কিছু খুঁজে পাওয়া তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং আর কোনো দিকে চেষ্টাচরিত্র না করে তিনি তাঁর দরিদ্র বিছানাটার ওপর গা এলিয়ে শান্তভাবে শুয়ে পড়লেন।

সম্ভবত জীবনের আরো একটা রূঢ় অভিজ্ঞতা লাভ করা তাঁর বাকি ছিল। গ্রামের চাষী মহলে নির্বোধ হরিপদ আর পরিতোষ যে যে বিবাদ ও মনোমালিন্য সৃষ্টি করেছিল সেটা

যে ধূমায়িত হয়ে চলেছে অনেক দিন পর্যন্ত সেটার সম্বন্ধে মাধব একেবারেই এতটা অবহিত ছিলেন না। তারা যে আজ গভীর রাত্রে তাদেরই পাওনা নিতে এসেছে, এও তিনি কল্পনা করেননি। সারাদিন পরিশ্রমের পর মাধবচন্দ্র অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

ব্যাপারটি অপ্রত্যাশিত হ'লেও অসাধারণ নয়, এমন কি গ্রামাঞ্চলে এ রকম ঘটনা সচরাচর ঘটেই থাকে। বাড়ির একটা অংশে আগুন লেগেছিল, মাধব ঘুমের ঘোরে কিছুই টের পাননি। সেই আগুন ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে যখন চারিদিক থেকে বেড়াজাল তৈরি করেছে তখন হয়ত তাঁর ঘুম ভেঙে থাকবে। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

পরদিন অথবা তারও পরদিন,—ঠিক হিসাবটা মেলে না, হরিপদ এবং আর দু'জন লোক মাধবের বিধবা ভগ্নী ও তাঁর বড় ছেলেকে সঙ্গে করে এসে পৌঁছলো। তারা দেখলে, বাড়িখানা এমন কি নীলকুঠির সীমানা পর্যন্ত এমন ভাবে ভস্মীভূত হয়েছে যে ঘর-দরজার কোনও চিহ্ন পর্যন্ত রেখে যায়নি। দগ্ধাবশেষ জিনিসপত্রের মাঝখানে মাধবের অন্তিমকালের এটা-ওটা সামগ্রী পাওয়া গিয়েছিল বটে স্তূপাকার গ্রন্থাবলী ও কাগজপত্র সমস্তই ধ্বংস হয়ে গেছে।

ভগ্নী সারাদিন বসে কাঁদলেন। হরিপদ এখানে ওখানে খবর নিয়ে জানলো, আগুন লেগেছিল মাঝরাতে—সে বিরাট আগুন,—তার চতুর্দিক্-ব্যাপী লেলিহান শিখা থেকে কর্তামশাই

অথবা পরিতোষ কেউ বাঁচেনি। তাঁদের ভস্মীভূত কঙ্কাল সেই ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে ধূলিরাশিতে পরিণত হয়েছে সন্দেহ নেই।

অপরাহ্নের দিকে সকলে বিদায় নিলেন। আগামী দু'দিনের মধ্যেই এ সংবাদ কলকাতার সকল সংবাদপত্রেই ছাপা হবে। বলা বাহুল্য মাধব রায়ের শেষ জীবনের ইতিহাস শুনে দেশের অনেকেই কৌতুক বোধ করবে।

গুয়াখোলা ওখান থেকে আট ক্রোশ দূরে। ছোট্ট চাষী গ্রাম। মুসলমান ও নমঃশূদ্র মিলে আট-দশ ঘর লোকের বাস। এ পাশে ছোটখাটো একটি জলের বাঁধ, ওধারে কয়েক ঝাড় কলাগাছ। এদিকে এবার ফসল হয়েছে মোটামুটি ভালো। মরাইগুলিতে ধান উঠেছে। মেয়েরা চাল তৈরির কাজে লেগেছে।

মাধবচন্দ্র একটি ছোট্ট চালায় আশ্রয় পেয়েছেন। তাঁর আধপোড়া চেহারা, মুখে দাড়ি এবং পরনে জোব্বা দেখে মৈনাকের বউ জিজ্ঞেস করলো, তুমি কী জাত গো ?

মাধব বললেন, বাউলের কি জাত আছে মা ?

ঘর কোথা ?

মাগো, সংসারময় আমার ঘর। মায়ের কোলে আছি দিনরাত।

ছোট ছেলেমেয়ের দল মাধবকে ঘিরে কী যেন আমোদ পায়। লোকটা কত রাজ্যের গল্প জানে। হাতীখেদার

রাজপুত্তুর—সে গিয়েছিল মহাবনে, সেখানে ছিল ময়দানবের প্রাচীন অট্টালিকা—সেই অট্টালিকায় থাকতো সোনার নূপুর পায়ে পরা স্বর্গের অপ্সরী চিত্রলেখা ;

তারপর ?

সেই মহাবনে থাকতো এক মহাপীর, সে ছিল পয়গম্বর ;

তারপর ?

বাউল বলে, বলবো সেই গল্প, শুনে তোরা ধেই ধেই করে নাচবি। ঠিক যেন জল-ফড়িং—ঝুমুর ঝুমুর নাচ।

ছোট ছেলেমেয়েরা ভারি মজা পায়। এমদাদ কাছে এসে হেসে বলে, কর্তা, তোমার জন্যে আমাদের কাজকর্ম হয় না।

কেন ভাই ?

হুল্লোড় করে তোমার থানে, কাজে মন নাই বউঝির।

মাধব হেসে বলে, আমি যে ওদের সকলের ছেলে,—গাঁ-ভরা আমার মায়ের দল ;

এমদাদ খুশি হয়ে চলে যায়।

মাধবের প্রতিষ্ঠা এখানে বেড়েছে। সাদাতের বড় মেয়ের পায়ের ঘা সারে না কিছুতে—বাউলের টোটকা তার ঘা সারিয়ে এনেছে। বাউল নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াচ্ছে জটীরামকে আজ কদিন হোলো—লোকটার পেটের ব্যামো সারলো এতদিনে।

একদিন হাফিজ মোড়ল তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কিছু কাজ জানো কর্তা ?

জানি বৈ কি, বাপজান। তোমার গোরু ক'টাকে আমি খাওয়াবো, চরাবো। খামারে কাজ করবো।

মোড়ল খুশি হয়ে বাউলকে একখানা কম্বল দিয়ে গেল।

বাউলের কাজ ফুরোয় না সারাদিনে। ছেলেমেয়েদের দলকে সে পড়ায়, গল্প শোনায়, তাদের কাপড় পরতে শেখায়, স্নান করায়—আবার তাদের মন ভোলাবার জন্যে সঙ্গীত-সঙ্ঘের সভাপতি লালন ফকিরের গানও গায়। বাউলের গান শুনতে আসে পাশের গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষ। মাধবচন্দ্র বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন।

এই ভালো, এর চেয়ে ভালো আর কল্পনায় নেই। সব ভুলে থাকা, সব হারানো, আত্মাভিমানের বোঝা নামানো পথের ধারে—এর চেয়ে সুখ আর নেই। সভ্যতার রেশ এখানে পৌঁছয়নি, নগরের কোনো মালিন্য নেই—এই ভালো। শকুন্তলা, রামায়ণ আর মহাভারতের ব্যাখ্যা হোলো এই নতুন জীবনে। বিরাট মহাজীবনের বীজ এখানকার মাটির নীচে ধীরে ধীরে প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে। মাধব রায়ের মৃত্যু ঘটেছে অগ্নিকাণ্ডের নীচে, সেই অঙ্গারের থেকে উঠেছে বাউল ভস্মরেণু মেখে।

মৈনাক আর তার বউ, হাফিজ মোড়ল, জটীরাম আর এমদাদ, মুনিয়া আর তার মা, সখারাম আর সাদাৎ—তাদের সঙ্গে আসে মাঠের লোক, গাঁয়ের নরনারী, আর সবাই, আর সকলে,—ওরা বাউলের গানের আসরে ভিড় করে।

মাধব মনে করেন, এই হোলো অমৃতলোক—মৃত্যুর ভিতর দিয়ে উঠে আসা এই লোকে। বিপুল অন্ধকার পৃথিবীব্যাপী, সর্বনাশা ধ্বংসের চক্রান্ত দিক্‌দিগন্তে, রুদ্রের করাল ভ্রূকুটি ছেয়ে গেছে বিশ্বময়, জীবনের অপচয় আর অপমৃত্যুর প্রবাহ চলেছে দেশদেশান্তরে; কিন্তু গুয়াখোলার এই ছোট্ট গ্রামে সোনার ধানের ক্ষেত পেরিয়ে প্রান্তর আর জলাবিল ডিঙিয়ে একটুখানি শান্ত অপার্থিব আলোর রেখা বাউলের বেড়াবাঁধা এই ঘরটির প্রান্তে এসে নেমেছে। মাধবচন্দ্র প্রাণের আনন্দে গান ধরেন,—আর আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ে তাঁর দুই চোখ বেয়ে।

ছবি

বিশ্বাস করো, কালের একটি নিজস্ব নিয়ম আছে। সংহার আর সৃষ্টি তোমার-আমার হাতে নেই, আছে কালের হাতে। মানুষের সমাজ নিয়ম বাঁধে, শৃঙ্খলা আনে, শান্তি চায়। কিন্তু কাল এই ব্যবস্থাকে জীর্ণ করে, ধ্বংস করে, কেননা তার বিচার নির্ভুল নিষ্ঠুর নিয়মে দাঁড়িয়ে। স্নেহ-মোহ-মায়া-প্রেম, এসব লৌকিক, মানবতার ঐতিহ্য,—বুদ্ধি দিয়ে অনুভব করো, দেখতে পাবে কালের মানদণ্ডে তার দাম কতটুকু! দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিপ্লব, মহামারী—এরা এদের পাওনা নেয় কালেরই সঙ্কেতে, মানুষের মতিভ্রম ঘটিয়ে, তা'তে ভয় পেয়ো না—

কথাগুলি বলতে বলতে ডাক্তার সেন স্টেথিস্কোপটি গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

শিববাবু কয়েকটি টাকা বের করে বললেন, আপনার নমস্কারীটে—

না থাক্, ওটা আর নেবো না—

থতমত খেয়ে শিববাবু বললেন, না, সে কি কথা! তবে কিনা ওদের অবস্থা বড্ড মন্দ, এর বেশি জোগাড় করতে পারেনি।

ডাক্তার সেন হাসিমুখে বললেন, আমাকে লজ্জা দিও না ভাই। ও টাকা আমার পাওনা নয়—

কেন বলুন ত?

যে-রোগীর বাঁচবার আশা নেই, তার কাছে আমি টাকা নিইনে।

আপনি বলছেন তাহ'লে মেয়েটা বাঁচবে না— ?

এদেশে অনেকেই বাঁচবে না—ডাক্তার সেন বললেন, তোমরা প্রস্তুত থেকো।—এই বলে তিনি মসমস করে চলে গেলেন।

শিববাবু আস্তে আস্তে ভিতরে এসে দাঁড়ালেন। মেয়েটার মায়ের কাছে চট করে খবরটা দেওয়া বোধ হয় উচিত হবে না। টাকা কয়টা তাঁর মুঠোর মধ্যে ইতিমধ্যে বেশ গরম হয়ে উঠেছে। ছেঁড়া ময়লা কয়েকটি একটাকার নোট—সরকারি ছাপ আর ছবি আঁকা,—তাই ত ওগুলোর দাম! নৈলে ময়লা কাগজের কুটি আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিলে ছোঁয় কে? একটা লৌকিক মূল্য এদের ওপর আরোপ করা হয়েছে, তাইজন্যেই ত মূল্যবান! কথাটা মনে হবামাত্র শিববাবু আবার ধীরপদে বেরিয়ে গেলেন। আপাতত টাকাটা তাঁর কাছেই থাক্, পরে দেখা যাবে।

পাড়ার কয়েকটি ছেলে চাঁদা তুলে রোগীর খরচ চালাচ্ছিল, এবং কোনো কোনো নির্বোধ আদর্শবাদী যুবক কয়েকদিন রাত জেগে রোগীর পরিচর্যাও করে চলেছে। কিন্তু নাসপাতি আর কমলালেবুর অমেক দাম, ডাব পাওয়া যায় না, ওষুধের দোকানের কিস্তির টাকা শোধ হয়ে ওঠে না,—সুতরাং রোগীর সেবাও সমস্যাসঙ্কুল। রোগের প্রথম দিকে মেয়েটার কী অসম্ভব ক্ষুধা ছিল! মুড়ি, গুড়, পান্তাভাত, ঘুগনি, তেঁতুলের আচার,—যা পেয়েছে হাতের কাছে, কিছু বাদ দেয়নি। সুস্থ শরীরে ওই মেয়েটার যেটুকু সংযম ছিল, রোগের

প্রথম ধাক্কায় একেবারে সে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। ওবাড়ির রান্নার ঘর থেকে কে যেন পচা মাছের ঘাঁট এনে দিয়েছিল লুকিয়ে, মেয়েটা নোংরা কাঁথার তলায় রেখে সেই ঘাঁট দস্তুর মতো গিলেছে। সেই ক্ষুধা তার কমলো যখন বাঁচবার আশা আর কিছু রইল না। সকল ব্যবস্থা আর চিকিৎসার বিরুদ্ধে মেয়েটা কী প্রতিবাদই জানিয়েছে!

শিববাবুকে দেখতে পেয়ে পাশের বাড়ির হুটু জিজ্ঞেস করলো, ডাক্তার কি বললে, শিবুদা?

শিবুদা বললে, চুপ; অনেক কথা আছে। এদিকে আয়।

আড়ালে এসে হুটু বললে, কম টাকা পেয়ে ডাক্তার কিছু বললে?

শিববাবু বললেন, তোর শিবুদার মুখের ওপর কে কি বলবে রে? শোন্ আসল কথা। টেঁপি বাঁচবে না,—বলি ওদের রেশন কার্ডগুলো কোথায় আছে বল্‌তে পারিস? রেশন্ কার্ড, বুঝলিনে?

হুটু বললে, টেঁপির মায়ের কাছে। কেন বলো ত?

মেয়েটার জন্যে আমরা এত করছি,—মেয়েটা মরে গেলে ওর কার্ড থেকে চিনিটা আমাকে তোরা দিবিনে? আমাদের বাড়িতে অনেক চায়ের খদ্দের। কিন্তু কায়দা করে চেয়ে নে দিকি কার্ডগুলো?

হুটু বললে, টেঁপির মা কিন্তু ভারি চালাক মেয়েমানুষ। মেয়ের নাম করে দুপুরবেলা পাড়ায় ঘোরে। টাকাটা সিকেটা

নিয়ে অনেক জমিয়েছে এর মধ্যে। মেয়েকে ছানার জল খাওয়ায়, কিন্তু ছানাটা খায় নিজে। ও চায় মেয়েটা মরুক।

শিবুদা বললে, দূর, ও চায় মেয়েটা ভুগুক। মেয়েটা থাকলে তবে ত চাঁদা তুলে রেশনের চাল চিনি পাবে। তোর যেমন বিদ্যে!

কথাটা ঘুরতে ঘুরতে টেঁপির মা'র কানে উঠেছিল। গলির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অসংলগ্ন চীৎকার তুলে সে বললে, এরা সব ভদ্দর লোকের ছেলে! কী মিথ্যেবাদী মা, কি বলবো। আমি চুরি করে খাই, লুকিয়ে লোকের বাড়ির আঁশ-হেঁসেলে ঢুকি—এই সব কথা ওদের! বলি, তোদের রেশন কার্ট্ থেকে আমি চাল নিয়েছি, না চিনি খেয়েছি? আমার বোনপোরা ছিল সে-বছর, তাদের নামে কার্ট করেছিলুম। কই, তোদের কাছে হাত পাততে যাই?

তার চীৎকারে এবাড়ি ওবাড়ি থেকে মেয়ে-পুরুষ বেরিয়ে এলো। স্থরেনের মা বললেন, তা ছোট বৌ, থামো, চুপ করো, ঘরে তোমার মেয়ে বাঁচে না, মেয়েটাকে একটু ত্থাখোগে।

তাই ত ছিলুম ভাই—ঝগড়া করতে এলো গায়ে প'ড়ে। সাতপো চিনি পাই রেশনে, তার মধ্যে পাঁচপো চিনি দইওলাকে বিক্রি করি—ত্নটো করে টাকা পাই হপ্তায়। আমার ভাই অত ঢাকাঢাকি নেই!

যাও ছোট বৌ—ঘরে যাও তুমি। ওরা অমন বলে, তুমি কান দিয়ো না।

. পরের অনুগ্রহে বাঁচলে কি হবে, টেঁপির মা'র ভয়ানক মুখের ঝাল। সে গর গর করতে করতে ভিতরে গেল। তখনও সে বলছে, পাঁচজনের পাত কুড়িয়ে খাই, তাই বলে পাঁচজনের কথা শুনবো? যদি না খেয়ে এ পাড়ায় মরে থাকি, তবে লজ্জা কা'র, পাড়ার লোকের নয়? কলঙ্কের কালি মেখে কেউ মুখ দেখাতে পারবে? সাবধান, আমাকে ঘাঁটিয়ো না।

একটা ছোকরা টিট্‌কিরি দিয়ে শুধু বললে, ওরে বাবা!

পাড়ার মধ্যে টেঁপির খ্যাতি ছিল কম নয়। ধীরু চাটুজ্যের বাড়ি ছিল ওই কলটার পাশে, অবস্থা খুব খারাপ ছিল না। যুদ্ধের আগে তিনি মারা যান্‌, কিছু টাকা আর কয়েকটি ছেলে-মেয়ে রেখে। বড় মেয়েটা চলে গেছে মামার বাড়ি—সে আর ফিরবে না। ষোল সতেরো বছরের ছেলেটা হঠাৎ একদিন মায়ের সঙ্গে বিবাদ করে কোথায় চলে যায়; সেটা সে বছরের দুর্ভিক্ষের সময়। টেঁপির মা অন্য পাড়ায় সন্ধ্যার দিকে গিয়ে যে ভাবে চা'ল ডাল সংগ্রহ করে আনতো, ছেলের কাছে সেটা অপমানজনক মনে হতো। টেঁপির মা তখন বাড়ি ফেরেনি অনেকদিন, অনেকদিন ফিরে এসেছে লুকিয়ে মাঝরাত্রে। এসব বরদাস্ত করতে না পেরে ছেলেটা একদিন কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।

কিন্তু এপাড়ায় টেঁপির খ্যাতি ছিল অন্য প্রকার। রেশনের চা'ল সে বেচে আসে অন্য পাড়ায় গিয়ে, বাজারে যায় আলুটা-পটলটা হাত সাফাই করতে। বড় রাস্তার ধারে গিয়ে কোনো

কোনো ইস্কুলের ছেলের সঙ্গে ভাব করে তাদের জলখাবারের পয়সা আদায় করে আনে, দুপুর বেলায় লোকের বাড়িতে ঢুকে ভিজে কাপড় টেনে নিয়ে পালিয়ে আসে,—সেই কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে অন্য কাপড়ের পাড় সেলাই ক'রে পরে। টেঁপির জন্য অনেকেই সতর্ক হয়ে থাকে।

পাশের বাড়ির পিসিমা গলা বাড়িয়ে ডাকলেন, ছোট বৌ, ঘরে আছো নাকি?

টেঁপির মা সাড়া দিয়ে বললে, কোথায় আর যাবো ভাই? ঘর ছেড়ে বাইরে গেলে কি আর জায়গা জুটবে?

ওর ভাষার বক্রতাকে সহ্য করা এপাড়ার অনেকেরই অভ্যাস হয়ে গেছে। পিসিমা বললেন, মেয়েটা এবেলা আছে কেমন?

শুকনো চক্ষু মুছে টেঁপির মা বললে, কঠিন অসুখে রুগী তাড়াতাড়িই মরে, না খেতে পেয়ে মরছে কিনা—তাই এত দেরি।

ওকথা বলতে নেই, ছোট বৌ।

কেন বলবো না দিদি? আর কারো বাড়িতে কই বাজ পড়ে না দেখি, আমারই ভাঙা ঘর ভেঙে যায় বার বার!

পিসিমা বললেন, কিছু খাচ্ছে কি?

কি আর খাবে বলো, ভাই। এত বিষ খেয়েছে যে, পেটে আর ওর জায়গা নেই!

পিসিমা চুপ করে রইলেন। টেঁপির মা নিশ্বাস ফেলে বললে, চাঁদা তুলে ঘর বাঁচে না ভাই।—এই বলে সে ভিতরে চলে গেল।

আধঘণ্টাখানেক পরে একটি ছোট ছেলে ছোট একটি ধামায় কিছু আহারসামগ্রী নিয়ে হাজির হোলো। বলা বাহুল্য, ও বাড়ির পিসিমাই পাঠিয়েছেন। আজ দ্বাদশীর দিনে বিধবার মনের কথা বিধবারাই জানে। ছোট ছেলেটা ফস করে বললে, আপনার উনুন ধরেনি, ছোটমামী ?

থাম্ বাছা—টেঁপির মা রুক্ষকণ্ঠে বললে, পরের ঘরের মজা দেখিস্‌নে। পোড়া দেশে কি কয়লা আছে যে উনুন ধরাবো ? মেড়ুয়া চোর আসে পাড়ায় কয়লা বেচতে,—তিনটাকায় বস্তা ! পাবো কোথা ?

ধামাটা খালি করে নিয়ে ছেলেটা চলে গেল। সমস্ত নীচের তলাটায় বীভৎস দারিদ্র্য। আর দুষ্টশক্তির ছায়া মৃত্যুর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে, এটা অনুভব করে ছেলেটাও আর দাঁড়াতে চাইলো না।

টেঁপির অসাড় ও নিশ্চল চেহারাটা এবেলায় আর আশাপ্রদ বলে মনে হচ্ছে না। গলার কাছে প্রাণটুকু ধুক ধুক করছে। কাল রাত থেকে মুখের একটা শব্দ হচ্ছে, যে-শব্দটা আগে শোনা যায়নি। নিমীলিত চোখ দুটোর পল্লব আর পড়ছে না। টেঁপির মা তার দিকে তাকিয়ে একবারটি দাঁড়ালো। তারপর তাড়াতাড়ি চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

কাঠকুটো কিছু সংগ্রহ ছিল বৈ কি। যে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে উনুন ধরিয়ে চাল-ডাল ধুয়ে ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিলে সেটা দেখবার মতো। কিছু সামগ্রী খরচ করলো, কিছু বা সংস্থান

রাখলো। নুন আর মসলা দিতে সে ভুললো না। একপাকেই সে রান্না করবে, সুতরাং একটু হলুদের গুঁড়ো আর গোটা দুই লঙ্কাও ফেলে দিল। লঙ্কা ক'টা বেনের দোকান থেকে একদিন এনেছিল টেঁপি,—এতদিনে সেগুলো খরচ হোলো। টেঁপির জন্যে তার খরচ বেঁচে যেতো অনেক। এরপর উনুনে একবার বাতাস দিয়ে চট্ করে সে স্নান সেরে এলো।

ফিরে এসে কোনোমতে কাপড়খানা বদ্‌লে আবার রান্নাঘরে এসে দেখলো, আলোচা'লের খিচুড়ি এরই মধ্যে দিব্যি ফুটে তৈরি হয়ে গেছে। হাঁড়িটা নামিয়ে রান্নাঘরে শেকল তুলে সে টেঁপির কাছে এলো।

টেঁপি তেমনি যোগ-নিদ্রায় মৃত্যুর মন্ত্র জপ করছে। ওর মা একবার ডাকলো, কিন্তু টেঁপির কাছ থেকে কোনো সাড়াই পাওয়া গেল না। সব কাজের আগে কাপড়খানা না ছাড়লে তার কিছুতেই চলবে না। টেঁপির মা এদিক ওদিক তাকালো। ধীরু চাটুজ্যের আমলের বিছানার চাদরে এতদিন ধরে সে চালিয়ে এসেছে, ছেঁড়া লেপের খোল জড়িয়ে কাজ সেরেছে সে কতদিন, গামছা সেলাই করেছে বহুবার,—কিন্তু এখন আর চলে না। গেল বছরে একখানা কাপড় পেয়েছিল সে রেশনের দোকানে,—সেই কাপড় একবার পরেছে মা, একবার মেয়ে। সস্তা সাবানে কাচতে কাচতে সেই কাপড়ে আর কিছু নেই। আজ তিনমাস থেকে শোনা যাচ্ছে কাপড় পাওয়া যাবে। গেল সপ্তাহেও শোনা গিয়েছিল, এই সপ্তাহে

দোকানে মাল আসতে পারে। কিন্তু টেঁপি মারা গেলে একখানা কাপড়ও যাবে কমে, আনবার লোকও পাওয়া যাবে না। সুতরাং আজ একবার শেষ চেষ্টা করার জন্য টেঁপির মা প্রস্তুত হোলো।

নীচু হয়ে সে মেয়েটাকে একবার বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে পরীক্ষা করলো। মৃত্যুর লগ্ন এখনই এসে পৌঁচেছে বলে ঠিক মনে হচ্ছে না। মেয়েটার বয়স হোলো পনেরো থেকে ষোলো—ধীরু চাটুজ্যের মুখের আদল এই মেয়েটার মধ্যেই খানিকটা পাওয়া যায়। আশ্চর্য সুশ্রী ছিল সবার মধ্যে এই কোলের মেয়েটাই। বয়সের সন্ধিতে বড় সুন্দর ফুল ফুটেছিল, বড় মধুর তরঙ্গ উঠেছিল হৃদয়ের তটে, কিন্তু অনাদরে আর অযত্নে গেল শুকিয়ে,—মরে গেল উপবাসে।

থাক্—বলে টেঁপির মা উঠে দাঁড়ালো। তারপর দেওয়ালের ফোকর থেকে তার অতি কষ্টে জমানো সাতটা টাকা আর রেশন কার্ডগুলি নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো। তাকে যেতেই হবে,— মেয়েটা মরবার আগে একটা হেস্তনেস্ত তার করাই চাই। অন্তত দুখানা কাপড় না হ'লে তার কিছুতেই চলবে না।

বড় রাস্তাটা পেরিয়ে গলির মোড়েই রেশনের দোকান। অনেকদিন পরে দোকানের ধারে সারবন্দি জনতা দেখে টেঁপির মা একটুখানি উৎসাহিত হোলো। সে গিয়ে দাঁড়ালো সকলের পিছনে। আগেভাগে কাপড় পাবার জন্যে তখন অত্যন্ত হৈ চৈ চলেছে।

হৈ চৈ অবশেষে হট্টগোল আর হাঙ্গামায় পরিণত হোলো—

যখন শোনা গেল দোকানে আর কাপড় নেই। সেই মারমুখী জনতা কদর্য ভাষায় চীৎকার করতে লাগলো। তারপর চললো আক্রমণ—ইঁটপাটকেল ছোঁড়া-ছুঁড়ি চললো দোকানের ওপর। সেই জনতা ক্ষুধার্ত্ত—তারা বিবস্ত্র, তারা বিদ্রোহী। ব্যবস্থাকে তারা ভাঙতে চায় বেপরোয়া হয়ে ; তারা আগুন লাগাতে চায়, নষ্ট করতে চায় যা কিছু। টেঁপির মা তাই দেখে ভিড়ের থেকে সরে এলো। আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে তারও চোখ থেকে। সেও চীৎকার করলো,—মার্ মার্ তোরা—ভেঙে দে, পুড়িয়ে দে, ওদের রক্তপাত কর্।

জনতার সেই প্রবল কোলাহলের ভিতর দাঁড়িয়ে মৃত্যু-শয্যাশায়িনী কন্যার কথা টেঁপির মা ক্ষণকালের জন্য ভুলে গেল। পিশাচীয় উল্লাসে ঘর্মাক্ত মুখে সে চীৎকার করলো, পুড়িয়ে দে তোরা, দোকান পুড়িয়ে দে। ওরা গেরস্ত মেয়েদের মান রাখে না, ওরা মুখের ভাত কেড়ে নেয়। ওদের জন্যে টেঁপি মরে—মার্ মার্, রক্ত নে ওদের·········

দোকানে আগুন ধরে উঠেছে, পুলিশ এসে পড়তে আর দেরি নেই। টেঁপির মা পাগলের মতো হাসিমুখে বাড়ির দিকে চললো এবার হন্ হন্ করে।

বাড়ি ঢুকে সে টেঁপির কাছে এসে একবার থমকে দাঁড়ালো। মেয়েটার মুখ থেকে সেই আওয়াজই নির্গত হচ্ছে,—তবে এবারে অতি মৃদু, অতিশয় ক্ষীণ। গলার কাছে প্রাণের চিহ্ন ধুকধুক করছে, অথবা করছে না—সেটি দাঁড়িয়ে দেখতে গেলে সময়

লাগে। কিন্তু টেঁপির মা ছুটে তখন চলে গেল রান্নাঘরের দিকে। ও কাজটা তার তাড়াতাড়িই এবার সেরে নেওয়া দরকার।

রান্নাঘর খুলতেই সে দেখলো একটি বিড়াল হাঁড়ির গা শুঁকছে। পলকের জন্য টেঁপির মা'র মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ভাঙা খুন্তিখানা ছিল হাতের কাছে, সেই খুন্তি নিয়ে সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে সে বসিয়ে দিল পলায়মান বিড়ালের পিঠের উপর। বিড়ালটা সাংঘাতিক ভাবে জখম হয়ে উলটে-পালটে গিয়ে পড়লো উঠোনের ওপর। রক্তাক্ত জন্তুটা ছটফট করতে লাগলো মাটির ওপর গড়াগড়ি দিয়ে।

অব্যর্থ লক্ষ্যের জন্য কী অসীম উল্লাস টেঁপির মা'র মুখে-চোখে! কিন্তু আর সময় নেই। থালার উপরে হাঁড়িটা উ[illegible] করে খিচুড়ি ঢেলে নিয়ে টেঁপির মা টাউ টাউ করে খেতে বসে গেল। অদূরে বিড়ালটা তখন রক্তধারার উপর ওলোট-পালোট খাচ্ছে। টেঁপির মা'র চোখে মুখে ছিল তীব্র প্রতিহিংসার রুক্ষতা। বিড়ালটার বাঁচবার কোনো আশা নেই।

আহারাদির পর আঁচিয়ে এসে টেঁপির-মা টেঁপির কাছে এসে দাঁড়ালো। শিশিতে একদাগ ওষুধ এখনও আছে, সেটুকু খাওয়াতে পারলে উপকার না হোক, অন্তত গলাটা ভিজবে। কিন্তু ওষুধের শেষ দাগ খাওয়াতে গিয়ে টেঁপির মা সহসা আবিষ্কার করলো, টেঁপি বেঁচে নেই! মায়ের হাতে অন্তিমের পরিচর্যার অপেক্ষা না রেখেই সে পালিয়ে গেছে।

মিনিট দুই টেঁপির মা স্থির হয়ে রইলো। একবার মনে

হোলো টেঁপি ওই ভাবে খানিকক্ষণ পড়ে থাক্, সেও নিজে খানিকক্ষণ টেঁপির পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে নিক,—বড় পরিশ্রান্ত সে। টেঁপি মরে গেছে, ঘণ্টা দুই যদি তার দেহ মায়ের পাশে ছড়ানো থাকে, ক্ষতি কি? মৃত্যুকে কিছুক্ষণের জন্য স্বীকার না করলেই ত হোলো!

হঠাৎ তার ঝট্‌কা ভাঙলো। সময় নষ্ট করলে চলবে না। টেঁপির পিঠের নীচে রয়েছে তোষক, সেখানা গেলে চলবে না। টেঁপির পরনে রয়েছে আস্ত একখানা ছোট কাপড়, সেখানা অবশ্যই ছাড়িয়ে নিতে হবে। তারপর ওই বালিশটা,—আজকাল তুলোর অনেক দাম। টেঁপির হাতে রয়েছে দু'গাছা রূপার চুড়ি!

সুতরাং একে একে সকল বন্ধন থেকে টেঁপিকে মুক্তি দেওয়া হোলো। সকল লৌকিক চিহ্ন তার দেহ থেকে তার মা দ্রুতহস্তে খুলে নিল। রইলো শুধু টেঁপি—একদিন যেমন সে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল এই ঘরেরই মেঝেতে—সজ্জাহীন, সর্বাভরণহীন! শুধু সেলাই-করা ঘরমোছা একখানা গামছা ছিল কোথায়, সেটার অনেকটা অংশ প্রদীপের সল্‌তে হয়ে পুড়েছে,—বাকি অংশটুকু এনে টেঁপির বুকের কাছ থেকে হাঁটু পর্যন্ত তার মা ঢেকে দিল।

সাতটা টাকা আর রেশন কার্ডগুলো গুছিয়ে রেখে একসময়ে টেঁপির মা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাবার দায়িত্ব তার নয়,—সেটা পাড়ার লোকের।

পাড়ার ছেলেরা চাঁদার পয়সায় বাঁশ কিনে টেঁপির জন্ত খাট বানিয়ে নিয়ে এলো পাড়ায় কিছু সোরগোল দেখা গেল। শিবুদা এসে বললে, টেঁপির রেশন কার্ড থেকে একখানা কাপড় পাওয়া যাবে, মড়া ঢাকা দেবার কাপড়,—ডাক্তারের সার্টিফিকেট্ নিয়ে গিয়ে দেখালেই কাপড় দেবে। ভালো শাড়ি হে।

একজন বললে, বাঁচলে কাপড় পাবে না, মরে গেলে তখনই পাবে। টাকা নিয়ে এক্ষুনি চলে যাও।

কিন্তু ভাই হাবু—বলে শিবুদা একটি ছোকরাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। বললে, মড়া শ্মশানে পৌঁছে কিন্তু কাপড়-খানা আমাকে খুলে দিয়ো ভাই। আমার বউয়ের আর দিন চলে না।

দু'টি ছোকরা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই কোরা একখানা ভালো শাড়ি সেই টালিগঞ্জের ওধারে কোন্ জন্ম-মৃত্যু-মার্কা রেশন্ আপিস থেকে কিনে নিয়ে এলো। টেঁপির মা একবার দেখলো সেই দিকে তাকিয়ে। তারপর বললে, মেয়েটা আমার, পাড়ার লোকের নয়,—আমি ওকে নিয়ে যাবো ঘাটে, আমি ওর মুখে আগুন দেবো।

শিবুদা টেঁপির মা'র চাতুরী বোঝে। বললে, সে কি কথা ছোট বৌদি, আপনি কেন যাবেন শ্মশানে ?

না ঠাকুরপো, আমাকেই যেতে হবে !

শিবুদা ছেলেদের মধ্যে কা'কে যেন টিপে দিল। ছেলেরা

যে যার কোথায় যেন সরে গিয়ে দাঁড়ালো। বলা বাহুল্য, যে নতুন সুন্দর কোরা শাড়িখানা ঢাকা দেওয়া হয়েছে টেঁপির সর্বাঙ্গে, সেখানার ওপর লোভ সকল পক্ষেরই। মৃত একটি কুমারীর প্রতি দৃষ্টি নেই কারো, লালপাড় শাড়িখানার রক্তাভার দিকে সকলেই লালসাতুর।

টেঁপির মা সকলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করে এক সময় চেঁচিয়ে বললে, বটে! পাড়ায় তবে মানুষ নেই, কেমন? বেশ, আমিও বসে রইলুম। মড়া পচুক, পাড়াময় গন্ধ ছড়াক্, আমি দেখতে চাই।

এমন সময় পাড়ায় কান্নার রোল উঠলো। চৌধুরীদের মেজছেলেটা যক্ষ্মায় ভুগছিল আজ ছয়মাস ধরে, সেই ছেলেটা মারা গেল। শিবুদা খুশি হয়ে বললে, যাক্, শাড়ি না পাই ধুতি একখানা পাবোই—ওতেই শাড়ির পাড় বসিয়ে কাজ চালাবো।

শিবুদার দলের কয়েকটি ছোকরা চৌধুরীবাড়ির দিকে ছুটলো। অপর তিনটি ছোকরা এগিয়ে এসে টেঁপির মাকে বললে, আমাদের ক্ষমা করুন, আমরা ঘাটে নিয়ে যাচ্ছি টেঁপিকে। আমরা মানুষ, কিন্তু জানোয়ারের সঙ্গে আমাদের তফাৎ এযুগে অনেক কমে গেছে!

টেঁপিকে নিয়ে গেল সবাই শ্মশানে। টেঁপির মা গেল তাদের সঙ্গে, কেননা নতুন শাড়িখানা তার অবশ্যই চাই।

চে দের বাড়ি থেকে ডাক্তার সেন তাঁর শেষ কাজ সেরে বেরিয়ে এলেন। যোগেন চৌধুরী ছিলেন তাঁর সঙ্গে চক্ষে জল

নিয়ে। ডাক্তার সেন বললেন, এক এক যুগ এসে দাঁড়িয়ে তার পাওনা নেয়। জীবনের অপচয় দেখে ভয় পাবেন না। মানব-প্রকৃতির বীভৎসতা যে কী ভয়ঙ্কর—এযুগে দেখে নিচ্ছি, আমাদের অগৌরব নেই। অপমৃত্যুর খেলা ছড়িয়ে চলেছে মহাকাল, দারিদ্র্য আর মহামারীর জুয়াখেলায়। কী উল্লাস তার !

স্টেথিস্কোপটা গলায় ঝুলিয়ে ডাক্তার সেন পুনরায় বললেন, ধ্বংসের চেহারা দেখে ভয় পাবেন না, মানুষকে মরতে দিন, লোকযাত্রার মালিন্য ঘুচুক। কিন্তু এ কেবল বিরাটতর বিপ্লবের ভূমিকা। চেয়ে দেখুন, সেই সর্বনাশা দিন এগিয়ে এসেছে !

যোগেন চৌধুরীকে ছেড়ে ডাক্তার সেন মস মস করে এগিয়ে গেলেন। এর বেশি তাঁর আর কিছু বলবার ছিল না।

আমাদের বাংলোটি ঠিক যে-অঞ্চলে দাঁড়িয়ে সেটি বাংলা ও বিহারের সংযোগস্থলে। আমাদের বাগানের পুবদিকে যে মোটরপথ, সেই পথটি এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে রামপুরহাট থেকে ডুমকার দিকে। কোনো কোনো সাপ্তাহিক ছুটির দিনে রাঙাবৌকে নিয়ে আমাকে ডুমকায় যেতে হয়,—সেখানে ওঁর পিসতুতো বোন আহুরীর শ্বশুরবাড়ি।

একদল মহুয়া আর কেঁদগাছের জটলার মাঝখানে এই বাংলোটি সম্প্রতি তৈরি হয়েছে। এদিকটা খুব নিরিবিলি। শহর থেকে খানিকটা হেঁটে আসতে হয় বলেই বন্ধুবান্ধবের সমাগম সম্ভবত কিছু কম। তা ছাড়া, আর একটা কথা, এ বাড়িতে ছেলেপুলে নেই বলেই রাঙাবৌয়ের পক্ষে এই নির্জনতাটা যেন বেশিরকম বুকচাপা। ফলে, বাংলোর গায়ে বড় সড়কটা ধরে যাত্রীপূর্ণ মোটরবাস্‌খানা যখন হু হু শব্দে চলে যায়, আমরা দুজনেই উৎকর্ণ হয়ে উঠি। কান পেতে থাকি, যদি কেউ গাড়ি থেকে নামে, কোনো পরিচিত মানুষের গলার সাড়া পাই। কিন্তু গাড়ি কোনদিনই থামে না, কারো সাড়াই পাইনে—মোটর বাস্‌ হু হু শব্দে ছুটতে ছুটতে এক সময় অদৃশ্য হয়ে যায়।

এমনি ভাবেই থেকে এসেছি আমরা দুজনে,—নিতান্তই দুজন। আমরা দুইয়ে মিলে এক, এবং একাগ্র, এবং অভিন্ন। দুইটি শব্দ মিলিয়ে যেমন একটি বাক্য, দুইটি কলিতে যেমন একটি পরিপূর্ণ নিটোল সঙ্গীত। জীবনের কোটরে আমরা

ছুটি পাখী একত্র বাসা বেঁধে নিশ্চিন্ত আনন্দে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে থাকি।

সহসা একদিন আমাদের চমক ভাঙে।—

একখানা মোটরবাস্ আমাদের বাগানের কাছাকাছি এসে সেদিন যেন হাঁসফাঁস করে থামলো। চকিতে রাঙাবৌ কেমন একটা অব্যক্ত কণ্ঠস্বরে কি যেন বলে থেমে গেল। আমার চেতনাটা সহসা যেন ক্ষুরধার উদগ্র হয়ে কান পেতে রইলো। আমাদের নিঃসঙ্গ জীবন সঙ্গলাভের জন্য আতুর।

চেঁচিয়ে ডাকলুম, খুটিয়া ?

মালী সাড়া দিল না।

সেটা ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে একটা তারিখ। শাল-শিশু-মহুয়া থেকে অবিশ্রান্ত শুক্‌নো পাতা ঝরে চলেছে। এবার স্পষ্ট শুনতে পেলুম, আমাদের বাগানের কাঁকর পাথরের পথে ঝরাপাতা মাড়িয়ে কা'রা যেন সন্তর্পণে এগিয়ে আসছে। রাঙাবৌয়ের পিছনে পিছনে আমিও বেরিয়ে এলুম। এবং বেরিয়ে এসে সামনেই যে মেয়েটিকে দেখলুম, তাকে দেখে আমরা ছুজনেই অবাক। সে আমাদের সেই স্বর্ণলতা।

রাঙাবৌ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো, কোথেকে এলি ?

স্বর্ণ হাসিমুখে বললে, উড়ে !

আমি বললুম, একা এলে ?

এবার স্বর্ণ হাসলো না। চোখ বেঁকিয়ে জবাব দিল, একা নয় ত কি সাতটা দারোয়ান আছে আমার ?

বলতে বলতে স্বর্ণ নিজেই আমাদের বারান্দায় উঠে এলো। তার পরনে সেই বহুকালের জানা নরুন-পেড়ে ধুতি, হাতে একগাছি করে কাঁচের চুড়ি,—এবং আগে পায়ে চটি দেখা যেত, এখন একেবারেই খালি পা। হঠাৎ আমার দিকে আর একবার তাকিয়ে ফস করে স্বর্ণ বললে, কী দেখছো? এখনো একাদশীতে নির্জলা উপোস ধরিনি। যেদিন এই কাঁচের চুড়ি আর নরুন-পেড়ে ধুতি ছাড়বো—সেইদিন, তার আগে নয়। বলি, চমক বুঝি এখনো ভাঙলো না?

বললুম, ভেঙেছে।

তাহ'লে এবার ঘরে ডেকে নাও?

আমি আর রাঙাবৌ ভুজনেই হাসলুম। রাঙাবৌ বললে, তুমি ত নিজেই এসেছো!

স্বর্ণ বললে, তাহ'লে শোনো—আবার যেন আঁক্ করে চমকে উঠো না—আমি একলা আসিনি।

বললুম, তবে?

স্বর্ণ আমাদের বাগানের দিকে একবার তাকালো। পরে ডাকলো, কই রে ভিখু? এবার বেরিয়ে আয়।

বাগানের ওধারে ছোট ছোট ঝাউ বসানো ছিল। তারই পাশ থেকে এবার একটি ফুটফুটে বালক হাসিমুখে বেরিয়ে এলো। ছেলেটির বয়স সাত আট বছরের বেশি নয়। স্বর্ণ হাসিমুখে বল্‌লে, এসো বাবা!—রাঙাবৌ, ছেলেটার হাতে কিছু দাও ত' ভাই, কাল সন্ধ্যে থেকে কিছু খায়নি।

রাঙাবৌ নড়তে পারলো না। পলকের মধ্যে আমাদের পায়ের তলায় যে-ভূমিকম্প ঘটে গেল, যে-দুর্ভেদ্য আবছায়ার মধ্যে সমগ্র পরিদৃশ্যমান সৌরজগৎ শূন্য হয়ে এলো—তারই ভিতর দিয়ে রাঙাবৌ কোথায় যেন নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। আমি সহসা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে রাঙাবৌয়ের হাতে চাপ দিয়ে বললুম, ছেলেটিকে কিছু খেতে দাও ত!

রাঙাবৌ দৌড়ে গেল রান্নাঘরের দিকে। তার পথের দিকে একবার তাকিয়ে প্রশ্ন করলুম, এ কে, স্বর্ণ?

সহাস্যে স্বর্ণ বললে, কে বলো ত?

গলার আওয়াজ আমার প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল। তবু বললুম, ছেলেটির মুখের সঙ্গে তোমার মুখ একেবারে মেলানো, তাই রাঙাবৌ চমকে গেছে!

স্বর্ণ বললে, মায়ের সঙ্গে সন্তানের মুখ মিলবে বৈ কি।

এরপরে আমার যে অদম্য ও অসহ্য কৌতূহল মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছিল, সেটি শান্ত হোলো রাঙাবৌয়ের পায়ের শব্দে। রাঙাবৌ দ্রুতপদে এসে ভিখুর হাত ধরে বললে, এসো বাবা আমার সঙ্গে, কিছু খাবে চলো।

রাঙাবৌ এখানে আর দাঁড়াতে চায় না কেন তা আমি জানি। ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি ভিতরের দিকে চলে গেল। বছর এগারো আগে একটি দিনের কথা বেশ মনে পড়ে, যেদিন গঙ্গার ঘাটে গিয়ে স্বর্ণ মাথার সিঁদুর মুছে কোরাধুতি পরে এলো। বিয়ের পর স্বামীকে নিয়ে স্বর্ণ ঘরকন্না করেছিল মাত্র

মাস ছয়েক ; আমি নিজে বিয়ে করেছিলুম তার বছর খানেক আগে। স্বর্ণদের বাড়ি হোলো কুমিল্লায়। প্রকাশ্যে স্থানীয় মেয়েমহলে সে লেখাপড়া নিয়ে থাকতো, এবং গোপনে সন্ত্রাসবাদীদের জন্য চাঁদা তুলে তাদের ব্যয়ভার বহন করতো। স্বভাবে অত্যন্ত প্রখরতা ছিল বলে মেয়েমহলে সে যথেষ্ট প্রিয় ছিল না। স্বর্ণর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় চাঁদপুরের পুলিশ আদালতে।

সেই স্বর্ণ আবার কবে বিয়ে করেছে, কবে তার সন্তান হোলো, কোথায় কি ভাবে সে ছিল এতদিন, এসব আমার জানা নেই। রাঙাবৌ মাঝে মাঝে তার নাম করতো, আমি কিন্তু কোনো কথাই বলতে পারতুম না। ওই পর্যন্তই, তারপর এতকাল চলে গেছে।

কিন্তু আজও তার বিধবার সজ্জা দেখে আমার নিজের মুখের চেহারাটাই আমার কাছে বিসদৃশ লাগছে। ভয় অথবা লজ্জা, অথবা ঘৃণা, কিম্বা বিস্ময়—ঠিক বোঝানো কঠিন। স্বর্ণর মুখে-চোখে কেমন একটা বিহ্বল বেপরোয়া উন্মাদনার আভাস লক্ষ্য করা যায়, ওটার মধ্যে আমার নিজ অতীতের একটা ইসারা আছে বলেই এখন যেন ভয় পাই। কিন্তু আমাদের এই মনোবিকারের প্রতি স্বর্ণ একটুও ভ্রূক্ষেপ করতে চায় না। অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে স্বর্ণ বললে, কত যে খুঁজেছি তোমাদের, কেউ কি বলতে পারে! দেশ ছেড়ে রাজ্যি ছেড়ে একেবারে জঙ্গলে এসে ঢুকেছ। তুমি নাকি এখানকার

পি-ডবলু-ডি'র ছোটসায়েব? শেষকালে চাকরি? এত দেশের কাজ, এত জেল-খাটাখাটি,—এবার বুঝি ভাঙা ঘর জোড়া দিতে বসেছ?

আমি হাসছিলুম।

স্বর্ণ বললে, উঃ, দেশ স্বাধীন হ'লে তোমাদের যে কি হোতো আমি তাই ভাবি।

বললুম, কেন?

তোমরা ত তখন বেকার! না বক্তৃতা, না দল নিয়ে মাতামাতি, না জেলে যাবার হুড়োহুড়ি! তার চেয়ে আগে-ভাগে এই ভালো! দেখে-শুনে মনে হচ্ছে এ তুমি ভালোই করেছ।

স্বর্ণ বার দুই পায়চারি করে ঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। ঘরের এদিক থেকে ওদিকে বার কয়েক পাক খেয়ে একসময়ে বললে, কতদিন হোলো বলো ত? বোধ হয় বছর এগারো —না?

বললুম, হ্যাঁ, তা প্রায় হোলো বৈ কি।

স্বর্ণ বললে, এর মধ্যে অনেক জমিয়েছ দেখছি! আসবাব-পত্র, শাল-দোশালা, এত ভালো ভালো সাজ-সজ্জা,—দুহাতে রোজগার করেছ মনে হচ্ছে!

রাঙাবৌ এবার শান্তভাবে বেরিয়ে এলো। বললে, ছেলেটির কী চমৎকার কথাবার্তা, কি মিষ্টি স্বভাব!

স্বর্ণ ফস করে বললে, নেবে তুমি ওকে?

রাঙাবৌ হাসিমুখে বললে, প্রাণ ধরে দিতে পারবে ?

স্বর্ণ আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে রাঙাবৌয়ের কথার জবাব দিল। বললে, ওকে একদিন প্রাণ ধরে তোমার হাতে দিইনি ? কৃতজ্ঞতা ভুলে গেছ ?

বিপ্লবী মেয়েটির কথায় যেন সেই আগেকার মতো একটি স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়লো। রাঙাবৌ তাড়াতাড়ি হেসে উঠে বললে, এবার বুঝি তাই অনুতাপ হচ্ছে ?

আমি বললুম, মেয়েলি তর্ক থামিয়ে এবার একটু ঠাণ্ডা হও দেখি।

আমার সঙ্কেত রাঙাবৌ বুঝে নিল, এবং পলকের মধ্যেই সে এসে স্বর্ণকে জড়িয়ে ধরে বললে, কত জিনিস তুমি জীবনে পেয়েছিলে, কিন্তু কোনোটাই ত হাতে নাওনি। এসো আমার সঙ্গে।

রাঙাবৌয়ের সঙ্গে স্বর্ণ ভিতরে গেল। কিন্তু স্বর্ণর শেষ কথাটা নির্ভুল ভাবে আমার কানে এলো। স্বর্ণ বললে, হাতে করে কিছু নিইনি বটে, কিন্তু যা পাবার তা আমি পেয়ে গেছি, রাঙাবৌ।

ছেলেটা আমাদের দুজনকে এইটুকু সময়ের মধ্যে বশীভূত করেছে অথবা অভিভূত করেছে, ঠিক বুঝতে পারছিনে। ওর মাথায় রাশীকৃত ঝাঁকড়া চুল, বুঝতে পারা যায় নাপিতের খরচ নেই। পরনে আধময়লা হাফ-শার্ট, আর হাফ-প্যাণ্ট,—

চোখে-মুখে কেমন একপ্রকার বন্যতা। এরই মধ্যে দুবার গাছ থেকে পড়েছে, চোট খেয়েছে মন্দ নয়। দুদিনের মধ্যেই কোথাকার দুটো সাঁওতালি ছেলের সঙ্গে ভিখু বন্ধুত্ব পাতিয়েছে। ফলে, কাঁচা আমলকি জোগাড় করেছে রাশি রাশি। আমার কাজের ফাঁকে বার কয়েক ভিখুকে কাছে ডেকে গোপনে আদর করেছি, কিন্তু তার মন পড়ে ছিল গাছের আড়ালে ডাকা ডাহুকের দিকে,—আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেনি। আমি বুঝতে পারি রাঙাবৌ এক এক সময়ে ভিখুকে কেন ছোঁ দিয়ে নিয়ে যায়। ভিখুকে নিরিবিলি তার পাওয়া দরকার। দুজনের মধ্যে কত অসংলগ্ন আলোচনা, কত রকমের জটিল প্রশ্ন আর উত্তর নিয়ে মীমাংসা। রাঙাবৌ ওর সঙ্গে যায় আমলকির বনে, ওর সঙ্গে মহুয়ার ফল কুড়িয়ে বেড়ায় সারাদিন। খুটিয়া আমাদের জন্য রান্নাবান্না করে।

সেদিন স্বর্ণ বললে, ছেলেটাকে ঘুষ খাওয়াচ্ছে তোমার বউ, দেখতে পাচ্ছ ত ?

আমি বললুম, কিন্তু ওর ভিখু নাম রাখলে কেন বল ত ?

ওকে যে ভিক্ষে করে পেয়েছিলুম।

স্বর্ণর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। হাসিমুখে সে পুনরায় বললে, এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটা করে ফেলো ?

বললুম, করলে কি সহজে জবাব পাবো ?

কেন পাবে না ?—স্বর্ণ যেন ফোঁস করে উঠলো। বললে, আমি কি সেই মেয়ে ? কখনো লুকিয়েছি ? কখনো

মিছে কথা বলেছি ? মনে করতে পারো কখনো ঠকিয়েছি তোমাকে ?

এমন সময় রাঙাবৌ এসে ঘরে ঢুকলো। কিন্তু স্বর্ণ থামলো না। বললে, আগুন দেখে তোমরা ভয় পেয়েছিলে, আর আমাকে আগুন নিয়ে খেলা করতে হয়েছিল,—আমার ভয় পাবার সময় ছিল না।

তাড়াতাড়ি বললুম, আগেকার কথা সব আমার আর মনে নেই, স্বর্ণ।

কেমন করে থাকবে ? তুমি যে এখন ছোট সায়েব ! কিন্তু বাইরে চেয়ে দেখো,—বান এসেছে, সব ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তুমি শুধু সামলাচ্ছ নিজের ঘর, নিজের স্বার্থ, নিজের পুরনো সংস্কার।—স্বর্ণের চোখে যেন আগুন ধকধক করছে।

আমি আর কথা বাড়াতে সাহস করলুম না, টুপিটা হাতে নিয়ে মসমস করে বেরিয়ে গেলুম।

যখন ফিরলুল, ভরা দুপুর। দেখতে পাওয়া গেল, বাগানের ফটকের কাছে রাঙাবৌ আর ভিখু, কি যেন গভীর আলোচনায় দুজনে মশগুল। আমি সাইকেল্ থেকে নেমে সামনে দাঁড়ালুম। সাইকেলের দিকেই ভিখুর ঝোঁক বেশি। আমি বললুম, চড়বি ? চড়তে জানিস ?

ভিখু বললে, আগে শিখে নিই।

সাইকেলখানা তার হাতে দিলুম। ভিখু খুব খুশি। রাঙাবৌ বললে, ছেলেটার দিকে ওর মার একটুও লক্ষ্য নেই, দেখেছ ?

বললুম, কেমন করে জানলে ওর মা ?

জানতে কতটুকু সময় লাগে ?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম, এ কেমন করে সম্ভব ?

রাঙাবৌ বললে, স্বর্ণর পক্ষে অসম্ভব কিছু আছে ?

তুমি কি বলতে চাও স্বর্ণ দ্বিতীয়বার বিধবা হয়েছে ?

আমি জানিনে।

এর বেশি আলোচনা করাটা আমাদের দুজনের কাছেই অপ্রিয়। আমি নীতিবিদ্ নই, এবং সমাজনীতি রক্ষা করাও আমার পেশা নয়। কেবল এক সময় বললুম, স্বর্ণ কি থাকবে এখানে কিছুদিন ?

রাঙাবৌ চুপ করে রইলো। একসময় আমি বললুম, কিছু শুনেছ তুমি ?

রাঙাবৌ বললে, এখানে থাকবে ক'দিন তা জানিনে, কিন্তু ওর যাবার জায়গা কোথাও নেই, এ আমি জানি।

কেন, ওর শ্বশুরবাড়ি ?

রাঙাবৌ আমার মুখের দিকে তাকালো। পরে বললে, শ্বশুরবাড়ি কোথায় সে নিজেই জানে না। তাছাড়া ও যাবার জন্যেও আসেনি।

ভিতরে এসে আমি একবারটি থমকে দাঁড়ালুম। পশ্চিমের ছোট ঘরটিতে আমার বইয়ের আলমারিগুলি সাজানো থাকে। আজ দেখি স্বর্ণ আলমারিগুলি খুলে রাশি রাশি বই মেঝেতে নামিয়ে নিজে সেগুলির মাঝখানে বসে

নাড়াচাড়া করছে। আমাকে দেখে মুখ তুললো। বললে, এসব করেছ কি ?

বললুম, কেন বলো ত ?

এত জঞ্জাল জমিয়ে রেখেছ কেন ?

বই কাগজকে তুমি জঞ্জাল বলো ?

বলি, যদি তোমার আমার জীবনের সঙ্গে তার যোগ না থাকে।—স্বর্ণ বলতে লাগলো, গত দশ বছরের কোনো চিহ্ন তোমার এই দেরাজগুলোয় নেই তা জানো ? পৃথিবী উল্টে গেছে, জীবনের চেহারা গেছে বদ্‌লে,—আর তুমি ? তুমি দশ বছর আগে থেমে গেছ, আর এগিয়ে চলতে পারোনি। এগুলো মরা বই, এর কোনো দাম নেই, কোনো কাজেই এগুলো আসবে না,—অথচ তুমি এগুলো পুষে রেখেছ, কারণ, এ তোমার সখ, তোমার শোভা, তোমার বিলাস।

হেসে বললুম, তোমার চাবুকের আওয়াজ বেশ লাগে, স্বর্ণ। পাখীরাও খড়কুটো গুছিয়ে বাসা বাঁধে, জানো ত ? হ'তে পারে আমি পথ ভুলেছি, কিন্তু তুমিও ভুল পথে চলেছ।

উপদেশ !—স্বর্ণ মুখ তুলে তাকালো। ঈষৎ রূঢ়কণ্ঠে পুনরায় বললে, কিন্তু বিশ্বাস যদি ভাঙে ? যদি শ্রদ্ধা হারায় ? থাকে কি ?

বললুম, তুমি কি এইটি জানাবার জন্যেই এখানে এসেছ ?

না, আমি এলুম প্রতিবাদ জানাবার জন্যে ! তুমি জমিয়ে তুলেছ সেইটেতেই আমার আপত্তি ! তুমি নেবার জন্যে

এবার হাত বাড়ালে কেন, তাই শুনতে চাই। এই গরীবের দেশে তোমার অবস্থা ফিরলো কেমন করে আমাকে বলো ত?

এবার হেসে বললুম, ওঃ এই কথা! বেশ ত, এক কথায় জবাব চেয়ো না,—এখানে থাকো কিছুদিন, গল্পগুজব করা যাবে।

স্বর্ণ ভ্রূ কুঁচকে বললে, কিছুদিন কেন, যদি চিরদিন থাকি?

আমি আবার হেসে উঠলুম।

স্বর্ণ বললে, তামাসা নয়, আমি সত্যিই থাকবো এখানে। তোমার বাড়িতে ঝি নেই, সময়-অসময়ে দেখবার কেউ নেই,—সুতরাং আমি আর যাবো না। ছুটি-ছুটি খেতে দিয়ো, একপাশে পড়ে থাকবো।

বললুম, কিন্তু ঝি-এর কাজ অন্য জায়গাতেও জুটতো!

দু'একখানা বই নাড়াচাড়া করে স্বর্ণ বললে, আমি জানি তুমি আমাকে তাড়াতে চাও, কিন্তু রাঙাবৌ আমাকে ছাড়তে চায় না। এই তিন দিনের মধ্যেই ভিখুকে সে দখল করেছে।

বললুম, ঝি-এর ছেলের সঙ্গে মনিব-গিন্নির সম্পর্ক জানো ত? ছিটে-ফোঁটা দয়া, একটু-আধটু উচ্ছিষ্ট, মেনি-বেড়ালের স্নেহ, পোষা কুকুরের প্রভুভক্তি!—ভিখুকে তুমি এত নীচে নামাতে চাও কেন?

স্বর্ণ বললে, তবে কোন্ দাবি নিয়ে এখানে থাকবো?

বললুম, মানুষ যেমন থাকে মানুষের কাছে!

যদি কোনো দাবি জানাই?

বেআইনী দাবি জানালে শুনবে কে ?

স্বর্ণ বললে, এ তোমার কোন্ আইন যে, একদল থাকবে আশ্রিত, আর একদল থাকবে সম্পদে গর্বিত ? একই জায়গায় থেকে কেন এই উঁচুনীচু সম্পর্ক ? তুমি দেবে আর আমি নেবো ? তুমি খাওয়াবে আর আমি খাবো ? কে তুমি ? কোন্ অধিকারে তুমি আমার চেয়ে বড় হতে চাও ?

বললুম, কথাটা কোন্ দিকে যাচ্ছে স্বর্ণ ?

এমন সময় রাঙাবৌ ছুটি খাবারের থালা হাতে নিয়ে ভিতরে এসে দাঁড়ালো। বললে, সাইকেলখানা রেখে ভিখু কোথায় গেল বলো ত ? আমার ভাবনা হচ্ছে ! খুটিয়াকে খুঁজতে পাঠালুম, কিন্তু সেও ফেরেনি।

রাঙাবৌর উদ্বেগের প্রতি স্বর্ণ কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলো না। বরং ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে সে বললে, হ্যাঁ, কথাটা সেইদিকে যাচ্ছে যেদিকে এযুগের মানুষের মন এগিয়ে চলেছে। তুমি জমিয়ে তুলেছ, তাই তুমি চাকার ওপরদিকে উঠেছ,—আমি জমাতে চাইনি, তাই নেমে গেছি চাকার নীচে। ব্যবস্থাটার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাও না কেন ? চোখ বুজে অন্যায়টাকে ধরে রাখতে চাইছ কোন্ বুদ্ধিতে ?

আমাদের কোনো কথা রাঙাবৌর কানে ঢুকলো না। খাবার জল টেবিলের ওপর রেখে সে দ্রুতপদে বেরিয়ে চলে গেল। স্বর্ণ তার ছেলের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন, একথাটা এই ক'দিনে রাঙাবৌ বিশ্বাস করেছে।

আমি বললুম, স্বর্ণ, তোমার নিজেকে পোড়াবার আগুন তুমি নিজেই মনের মধ্যে জ্বালিয়েছ, সেই আগুনে তুমি বাইরে অগ্নিকাণ্ড করতে চাইছ।

স্বর্ণ উঠে ঘরময় বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলো। একসময় থেমে বললে, মানুষের বাঁচবার জন্যে খাওয়া, আর এককালের সভ্যতাকে অন্যকালে এগিয়ে দেবার জন্যে সন্তানধারণ—একথা কি তুমি মানো না?

কথাটা অস্পষ্ট, তবুও মানি।

তবে ধনসম্পত্তি আর জায়গা-জমি নিয়ে এই বিবাদ কেন? যা তোমার থাকবে না, তাই জমাবার কেন এই চেষ্টা? তুমি ছিলে আমাদের দলের একজন ছোটখাটো নেতা। সেদিন তুমি আমাদের কি শিখিয়েছিলে? দুর্গম পথে আমাদের ঠেলে দিয়ে তুমি কেন এসে জন্তুর মতন জঙ্গলে লুকিয়েছ?

বললুম, তোমাদের এই বুদ্ধির জন্ম হয়েছে ঈর্ষার থেকে।

স্বর্ণর মুখে এতক্ষণ পরে হাসি দেখা দিল। বললে, এইবার মনে হচ্ছে তুমি রাগ করেছ। কিন্তু এ তোমার অত্যন্ত ভুল। মনে রেখো, সকলের দাবি সমান—এই কথাটা এসেছে ঈর্ষার থেকে নয়, ভালোবাসার থেকে। ভালোবাসার এতবড় চেহারা এযুগে দেখা যাচ্ছে বলেই একদল তাকে ধ্বংস করার ফন্দি আঁটছে। তুমি হ'লে সেই দলের লোক।

স্বর্ণর বলার ভঙ্গীতে আমরা দুজনেই হেসে উঠলুম।

মেয়েলি ছাঁদে ঢালা মেয়ে স্বর্ণ নয়। তর্ক করে পুরুষের মতন, ভাষাটা পুরুষের। ইতিমধ্যে ভিখুকে আমাদের হাতে দিয়ে সে একপ্রকার নিশ্চিন্তই আছে। মাতা ও পুত্রের মাঝখানে আসক্তির যোগ বড়ই কম, এবং সেটা আমাদের চোখে একটুখানি বিসদৃশ সন্দেহ নেই। স্বর্ণর জীবনে কোথায় একটা ইতিবৃত্ত চাপা রয়েছে, সেইদিকে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর দৃষ্টি অনেকটা সজাগ থাকে বৈ কি।

সেদিন কথা তুললুম, আর কিছু না হোক, ছেলেটাকে একটু-আধটু লেখাপড়া শেখাও, মানুষ করে তোলো ?

স্বর্ণ বললে, শেখাবার মতন লেখাপড়া জানা আছে কার ? লোকসমাজে ভেড়া-ছাগলের সংখ্যা না-ই বাড়লো ?

তবে মানুষ হবে কেমন করে ?

মানুষ করতে গিয়ে যদি বনমানুষ হয়, কিম্বা তোমার মতন ?

আমার দুরবস্থা দেখে রাঙাবৌ খিলখিল করে হেসে উঠলো। আমি বললুম, পেটের ছেলের ওপর এই অবিচার সইবে না, স্বর্ণ।

স্বর্ণ বললে, ভয় পেয়ো না, দেশে মানুষ থাকলে ভিখুও একদিন মানুষ হবে।

ওর বাবার মৃত্যু হয়েছে কতদিন ?

ওর বাবা! স্বর্ণ রাঙাবৌর দিকে তাকালো। পুনরায় বললে, যতদূর মনে হয় ওর বাবার মৃত্যু হয়নি।

রাঙাবৌ সহসা যেন কেঁপে উঠলো। আমি বললুম, তবে তুমি এই বৈধব্যের সজ্জা নিয়েছ কেন?

স্বর্ণ হাসলো। বললে, আমার শরীরের ওপর দিয়ে একজন পুরুষের অস্তিত্ব দিনরাত ঘোষণা করতে থাকবো—এই দাসীত্বই বা কেন? সবাই রাঙাবৌ হয়ে জন্মায়নি।

তুমি কি দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলে?

স্বর্ণ ঠোঁট উল্‌টিয়ে বললে, সত্যি বলতে কি, আমি একবারও বিয়ে করিনি।

রাঙাবৌ এবার অধীর কণ্ঠে বলে উঠলো, অমন সব্বনেশে কথা বলতে নেই, স্বর্ণ। ভিখুর কপালে কালি মাখিয়ো না। ভিখু যেন চিরকাল মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকে।

আমি রাঙাবৌর মতো অত অধীর হইনে। স্বর্ণর হাস্যমুখের দিকে চেয়ে আমি বললুম, কিন্তু ছেলেটাকে সত্যিই ত আর পথ থেকে কুড়িয়ে পাওনি তুমি! রাঙাবৌ, তুমি যদি অত অস্থির হও তবে রান্নাঘরে গিয়ে বসোগে।

স্বর্ণ বললে, আমি ত বলেছি ভিখুকে ভিক্ষে করে পেয়েছি।

কার কাছে ভিক্ষে করেছিলে?

তার নাম-ধাম কোনোটাই জানতে চাইনি। আমাকে ভিক্ষে দিয়েছে এই যথেষ্ট।

বললুম, ভিক্ষে করতে গেলে কেন?

স্বর্ণ বললে, তবে শোনো। যে কারণে তুমি ঘর বেঁধেছ, সেই কারণেই আমি সন্তান ভিক্ষে করেছি! তোমার সংযম

নেই, জৈবজীবনকে তুমি গৃহকর্ম্ম নাম দিয়েছ ; আর আমি যে সংযত তার প্রমাণ, ওটাকে ওইখানে শেষ করে অন্যদিকে মন দিয়েছি। এবার আমি সাংঘাতিক অস্ত্র হাতে নিয়ে জগদ্ধাত্রী হবো, তার কারণ অসুরকে দাবিয়ে রেখেছি পায়ের তলায়। ওটার কাছে আর আমি হার মানবো না।

কথাটা শুনতে শুনতে রাঙাবৌর চোখ দুটো যেন পলকের জন্য জ্বলে উঠলো। এবার সে মৃদুস্বরে বললে, কিন্তু ভিখুর একটা পরিচয় ত থাকা দরকার! ধরো, ভদ্রসমাজে—

খুব সহজ।—স্বর্ণ বললে, তুমি ওর মা হও, ছোটসায়েবকে ভিখু বাবা বলুক। অভ্যস্ত নীতিবুদ্ধির সংস্কার ত্যাগ করো, দেখবে কোথাও আর বিরোধ নেই।

রাঙাবৌ বললে, এতে কি তোমার সম্মান বাড়বে স্বর্ণ?

আমার সম্মানকে তোমার নীতিজ্ঞানের সঙ্গে বাঁধতে চাও কেন? মহাবীর কর্ণের পিতার সন্ধান পাওয়া যায়নি, তাই ওকে বলা হয় আদি অগ্নিকুণ্ডের সন্তান। এতে কর্ণ আর কুন্তী কেউই ছোট হয়নি। জন্মটা আকস্মিক, মনুষ্যত্বের পথটা চিরকালের। ভিখুর বাবা যে-খুশি হোক আমার আপত্তি নেই, আমি ওর মা—এই যথেষ্ট। মহাভারতের সভ্যতা মাতৃপ্রধান, পিতৃপ্রধান নয়।

স্বর্ণ সেখান থেকে চলে গেল।

আমরা স্বামী-স্ত্রী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।—মনে হোলো রাঙাবৌ যেন খানিকটা আঘাত পেয়েছে, তার নিজের জীবনের

শাস্ত্রটার সঙ্গে স্বর্ণকে সে মেলাতে পারছে না। কিন্তু আমি স্তব্ধ হয়েছিলুম এই কারণে যে, সন্তানের প্রতি স্নেহ-মোহবন্ধনটাকেও স্বর্ণ জয় করেছে,—তার কথাবার্তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন অস্পষ্ট আসক্তিও আমি খুঁজে পেলুম না। সন্তানটাকে জঠরে ধারণ করেছি বলেই যে চিরস্থায়ী বাঁধনকে স্বীকার করে নেবো, এমন কোনো কথা নেই। স্বর্ণ বার বার এই কথাটাই বলেছে। সে বলে, স্বামী নামক কোনো পদার্থ মানিনে, মানি পুরুষকে, মানি সৃষ্টিকর্তাকে। তোমরা ঘর বেঁধেছ, তাই ঘরগড়া নীতিও স্বীকার করেছ,—কিন্তু আমি যদি এই সংস্কারকে বুঝতে না পারি? যদি বলি যে-কোনো জাতের পুরুষ হ'লেই মেয়েরা খুশি,—কেননা আসলে প্রয়োজন সন্তান,—স্বামী নয়। স্বামী বলো, পুরুষ বলো, তারা হোলো উপকরণ,—পুজা হোলো সন্তানের। সন্তান আমার হয়েছে, সুতরাং পুরুষকে আর আমার দরকার নেই। আমার পথ আমি নিজে বেছে নেবো।

সেদিন প্রশ্ন করেছিলুম, তোমার পথ মানে?

স্বর্ণ বললে, আমার দেশ, আমার জাতি, আর নিজের স্বচ্ছন্দ স্বাভাবিক জীবন,—যাকে বলে স্বাধীন!

বললুম, কিন্তু স্নেহ ছাড়া সৃষ্টি নেই। স্নেহহীন সৃষ্টি মানে মরুভূমি। কোন্‌টা তুমি চাও?

উপমা দিয়ো না।—স্বর্ণ বললে, ওতে আসল কথা ফোটে না। তুমিই একদিন বলতে, আমাদের সকল রকম কল্পনার

চেয়েও জীবনটা বিরাট, বিরাটতর তার তপস্যা। স্নেহহীন সৃষ্টিকে বলছ মন্দ? তুমিই না মেঘনা নদীর ধারে একদিন এক সভায় বলেছিলে, সৃষ্টি মানে প্রকৃতির নিষ্ঠুর কৌতুক? ঝড়ে পুরনো ঘর ওড়ায়, বান এসে নতুন জমি বানিয়ে যায়, ভূমিকম্পে হয় নতুন সভ্যতার পত্তন, আর যুদ্ধ আসে জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে নেবার জন্যে,—কিন্তু এরা যে স্নেহহীন! আমার জীবনের মাটিতে একটি ফসল ফলেছে,—জঠরের অন্ধকার রহস্যলোকে তাকে সস্নেহে লালন করেছি, তার ফলে বীজ থেকে অঙ্কুর, ফুল থেকে ফল। তারপর সে ত জগৎসভার ভোজ্য! আমার সঙ্গে ভিখুর আর সম্পর্ক রইলো কোথায়?—এই বলে স্বর্ণ চুপ করে গিয়েছিল। আমি আর কথা না বাড়িয়ে সাইকেলখানা নিয়ে অফিসের দিকে চলে গেলুম।

চেয়ে দেখি শালবনের তলা দিয়ে পায়ে চলা পথ ধরে স্বর্ণ বহুদূর চলে যায়। তার চলার ভঙ্গী দেখে মনে হয় পিছনের পায়ের দাগ মুছে গেলেও তার ভ্রূক্ষেপ নেই। এদিকে কোথায় যেন সাঁওতালপাড়া, কোথায় যেন আছে তালের জঙ্গলে ঘেরা জলের বাঁধ,—স্বর্ণ তারই সন্ধানে ফিরছে। সুন্দর ছায়াবীথিকা, সভ্যতার থেকে দূরে, পারিপার্শ্বিক গ্রাম-জীবনের স্বভাব-সরলতা, —স্বর্ণ সেই নিরিবিলি পথের ধারে হয়ত বসে ভাবলো, এইখানে যদি বাকি জীবনের জন্য একটুখানি জায়গা পেতুম! যখন সে ফিরে আসতো, চেয়ে দেখতুম, তার চোখে মুখে কেমন একপ্রকার বন্যতা। বুঝতে পারা যেতো, কত বাসনা আর

ক্ষুধার দাগ রেখে এসেছে সে পথে-পথে। আমি যেন তার নাগাল পেতুম না।

এই ক'দিনেই স্বর্ণ আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল, আমি ভাঙতে চাইনে, গড়বার শক্তিও আমার নেই। আমি শুধু অস্বীকার করে যাবো। অভ্যস্ত ভাবনার ধারাকে আমার জীবনে কোনোদিন ঠাঁই দিতে পারবো না। তুমি সমুদ্র সামনে দেখে ভয় পেয়ে ঘরে ঢুকেছ, আর আমি বাঁধনের ভয়ে সমুদ্রের অন্ধকারে ভেলা ভাসিয়েছি। তলিয়ে যদি যাই, তবে সেইখানে যাবো যার তল খুঁজে পাওয়া যায় না।

একদিন এই অগ্নিহোত্রী আমাদের কাছে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হোলো। রাঙাবৌকে ডেকে বললে, সত্যি বলো, ভিখুকে কি তুমি নিতে পেরেছ?

রাঙাবৌ অবাক হয়ে দাঁড়ালো। স্বর্ণ বললে, ভিখুর ভার আমি আর বইতে পারছিনে রাঙাবৌ।

রাঙাবৌ বললে, কোথায় যাবে তুমি?

স্বর্ণ হেসে বললে, যেখানে যায়নি কেউ এর আগে।

উষ্ণকণ্ঠে আমি বললুম, থাকবে কোথায়? তোমার চলবে কেমন করে?

স্বর্ণ বাঁকাচোখে বললে, পুরুষের আত্মাভিমানে ঘা লাগছে বুঝি?

রাঙাবৌ বললে, ভিখুকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে?

ভিখুকে ধরে রাখলে দুজনেই দুঃখ পাবো। তোমরা ওকে নাও ভাই।—এই বলে স্বর্ণ আমার দিকে তাকালো।

আমি বললুম, কোন্ অধিকারে নেবো ?

স্বর্ণ বললে, যে পালন করে সে পিতা !

ভিখু তোমায় ছাড়বে কেন ?

আমি এখন ভিখুর সঙ্গী,—মা ও সন্তান নয়। তার সঙ্গী থাকলেই সে খুশি। তাছাড়া ওর মেরুদণ্ড বজ্র দিয়ে তৈরী, আমি গেলে ও নুইবে না।—স্বর্ণ বললে, আমাকে হাসিমুখে যেতে দাও।

মুখ ফিরিয়ে দেখি, রাঙাবৌর চোখ দিয়ে টসটস করে জল পড়ছে। বেদনা আর আনন্দের জারক রসে সেই অশ্রু মেলানো। স্বর্ণ তার দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললে, ওই চোখের জল ভিখুর মাথায় পড়ুক,—ভিখুর কোনো অভাব থাকবে না। —ও কি, চেয়ে আছো যে ?

বললুম, কি শুনতে চাও ?

স্বর্ণ বললে, তুমি কি এতবড় কাপুরুষ যে, একটি শিশুর ভবিষ্যৎ হাতে নিতে পারো না ?

বললুম, আশ্রিত-বাৎসল্য ?

স্বর্ণ বললে, না গো না, সোজা হিসেব। ভিখু তোমার সন্তান।

রুক্ষকণ্ঠে বললুম, ধাপ্পা !

অধীর কণ্ঠে স্বর্ণ বললে, না, না, মনের মধ্যে তলিয়ে দেখো,

কল্পনায় ভাবনায় বেঁধে নাও,—বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করো,—ভিখু তোমারই সন্তান!

বললুম, এ শুধু যাবার আগে রাঙাবৌকে জব্দ করবার চেষ্টা।

রাঙাবৌ দৃঢ় শান্তভাবে এগিয়ে এলো। বললে, এত ছোট আমি হতে পারবো না। আমি নিলুম ভিখুকে, আমি ওর মা,—কায়মনোবাক্যে! ওর আমি চিরদিনের মা।

ভিখু দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। রাঙাবৌ ছুটে গিয়ে তাকে কোলে নিল। স্বর্ণ এবার হাসিমুখে প্রশ্ন করলো, আচ্ছা ভিখু, তোর বাবা কে রে?

আমার দিকে নির্দেশ ক'রে ভিখু বললে, ওই ত!

আমি বললুম, ওরে হতভাগা, কেমন করে জানলি আমি তোর বাবা?

ভিখু বললে, এ বাড়িতে ঢোকার সময় মা আমাকে বলেছে।

রাঙাবৌ মাথা উঁচু করে বললে, এ খবর সত্যি হ'লে আমার দুঃখ নেই, মিথ্যে হ'লেও আনন্দ নেই। আমার ঘরে এতদিন পরে আলো জ্বললো এই আমার লাভ!

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, কিন্তু স্বর্ণ যে তোমার স্বামীর চরিত্রের ওপর দাগ দিয়ে যাচ্ছে গো!

রাঙাবৌ বললে, একটুও না। এ সন্তান যদি তোমারই হয়, তোমার চরিত্রে দাগ দেবে কে?

তার মানে?

মানে, আমার কোল ভরেছে। এই আমি চেয়েছিলুম বলে রাঙাবৌ ভিখুকে নিয়ে সেখান থেকে সরে গেল।

পরদিন ভোরে খুটিয়া আমার ঘুম ভাঙালো। বললে, বাবু, ঘরের দরজা খোলা, গেট্ খোলা।

আমি বললুম, তাই নাকি? আচ্ছা, তুই যা—

খুটিয়া শশব্যস্তে বললে, বাবু, নতুন দিদিমণিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি পাশ ফিরে নিশ্চিন্ত হয়ে বললুম, বটে! আচ্ছা—তুই যা।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাঙাবৌ ঘরে ঢুকে বললে, ওগো শুনছ? স্বর্ণ আমাদের না জানিয়ে চলে গেছে,—ভিখুকেও নিয়ে গেছে সঙ্গে। ভিখুকে বিশ্বাস করে রেখে গেল না।

বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে বললুম, তুমি স্বর্ণকে এখনো চেনোনি। দেখো দেখি আমলকি গাছের ডালে, ভিখু হয়ত মনের আনন্দে ফল পাড়ছে। ছেলেটা ভারি দুরন্ত।

রাঙাবৌ ছুটে বেরিয়ে গেল, এবং মিনিট দুই পরে হাস্য-গৌরবে ফিরে এসে বললে, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, ভিখুকে খুঁজে পেয়েছি। কে যেন আমার গলা টিপে ধরেছিল। আমি বাঁচলুম।

কোলাহল-কলরবে ঘর মুখরিত করে রাঙাবৌ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি চোখ বুজে স্বর্ণকে অনুসরণ করছিলুম। তার পায়ের দাগ দেখতে পাচ্ছি বহুদূর পর্যন্ত। কিন্তু তারপর আর তাকে খুঁজে পাচ্ছিনে। কোন্ দিকে সে গেল? বিহারের পথ ধরে বৃহত্তর ভারতে, কিংবা বাংলায়—যেখানে বার বার সোনা গ'লে গিয়েও সোনাটা ঠিক থাকে?

চওড়া পথের একটা অংশ চলে গেছে ট্রাম-রাস্তার দিকে, অন্য অংশটা চলে এসেছে উত্তরে। কিছু দূর এলেই বাঁ-হাতি সরু গলি,—কিন্তু গলিতে ঢুকে খানিকটা এগিয়ে এলেই বুঝতে পারা যায়, বেরোবার আর পথ নেই—ওটা চোখবন্ধ গলিপথ।

বাড়ির নম্বরটা মিলিয়ে দেখে দীপ্তি একটু থমকে দাঁড়ায়। ঘিঞ্জি ঠাসাঠাসি বাড়ির জটলা,—নিরেট জমাট ইমারতের ভিড়ে এই সঙ্কীর্ণ অন্ধ গলিপথ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এসেছে। দীপ্তি এদিক-ওদিক তাকায়,—শীতের অপরাহ্নের ধোঁয়ায় কোনো বাড়ির নম্বর ঠাহর করার উপায় নেই। এপাশ-ওপাশের স্তূপীকৃত পুরনো আবর্জনার বীভৎস দুর্গন্ধে দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিন। দীপ্তি উদ্‌ভ্রান্তভাবে কিয়ৎক্ষণ ঘোরাফেরা করে একটু বিব্রতভাবেই বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে, এমন সময় একটি ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন, কত নম্বর চান্?

দীপ্তি সপ্রতিভভাবে জবাব দেয়, নম্বরটা ঠিক জানিনে, তবে যুগলবাবুর বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?

যুগলবাবু?

আজ্ঞে হ্যাঁ,—এই গলিতেই হবে আমার বিশ্বাস। অনেক কাল পরে কিনা—গলিটার চেহারা বদ্‌লে গেছে।

ভদ্রলোকটির হাতে ছিল গোটা দুই ফুলকপি,—অর্থাৎ—সওদাগরী অফিসের ভব্যতাযুক্ত কেরানি, সুতরাং তাঁর দাঁড়াবার সময় ছিল না। তিনি বললেন, দেখুন, যুগলবাবু বললে এখানে

কেউ চিনবে না। বাড়ির নম্বরটা চাই,—এখানে কেউ কারো নাম জানে না।

দীপ্তি বললে, এ পাড়ায় তাঁর কিন্তু বেশ নামডাক ছিল !

ভদ্রলোক হেসে বললেন, হয়ত ছিল, এখন ডুবে গেছে। দেখুন, যদি পান। এই বলে তিনি অগ্রসর হ'লেন।

আর দুটি লোক পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল, দীপ্তির চেহারায় আকৃষ্ট হয়ে বললে, কা'কে চান ? কত নম্বর ?

পাশের বাড়ি থেকে একটি ছোকরা বেরিয়ে এসেছিল এবং উপরের এক বারান্দায় দু'তিনজন কৌতূহলী স্ত্রী-পুরুষ দাঁড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ যাকে বলে একটি ছোটখাট জনতা। অসংখ্য প্রশ্নের মাঝখানে কেবল একটি প্রৌঢ় লোক প্রশ্ন করলেন, যুগল চৌধুরী কি ?

সোৎসাহে দীপ্তি বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ—

ওই যাঁর এক মেয়ে পাগল হয়ে গেছে ?

দীপ্তি বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ—সেই যুগল চৌধুরী !

এসো মা আমার সঙ্গে। তবে যুগল চৌধুরী ত বেঁচে নেই ?

বেঁচে নেই !—দীপ্তি যেন থমকে থতিয়ে গেল।

না মা,—তিনি ত আট ন' বছর আগেই মারা গেছেন। যুদ্ধের অনেক আগে। এসো মা, আমি সেই বাড়িতেই ভাড়া থাকি।

ভদ্রলোক অগ্রসর হ'লেন। দীপ্তি চললো তাঁর পিছনে পিছনে। ওই চোখবন্ধ গলিপথটাই আঁকাবাঁকা। কর্পোরেশনের

একটা আলো জ্বলছে অনেক দূরে—কিন্তু তার আভা এতদূরে পৌঁছয় না। দেখতে পাওয়া যায়, এই গলি এখন অনেকগুলি বাড়ির পিছন দিকে পড়ে গেছে, সুতরাং বিচিত্র জঞ্জাল আর আবর্জনায় আনাগোনার পথ অনেকটা অবরুদ্ধ। ওদের নাকে দুর্গন্ধ লাগে না, স্তূপাকার আবর্জনায় ওদের অসুবিধা নেই, ওরা এতে অভ্যস্ত, এতে সুপরিচিত।

ভদ্রলোক বললেন, বোধ হয় তুমি নতুন এসেছো, তাই চিনতে দেরি হচ্ছে। আগের সেই কলকাতা এখন আর নেই। চেনা মানুষকেও চিনতে পারা কঠিন।

নাকের উপর থেকে রুমাল সরিয়ে দীপ্তি বললে, তেরো চোদ্দ বছর পরে এলুম। দেখতে পাচ্ছি সমস্তটাই ওলোট-পালট।

হাসিমুখে ভদ্রলোক বললেন, এ গলিতে দিন-দুপুরে লোক যেতো না, এত নির্জন। এখন লোক ধরে না। যে বাড়িতে পাঁচজন থাকতো, এখন সেখানে পনেরো জন। এই ত শৈলেনদের কী কষ্ট—এতটুকু জায়গা নেই, তার ওপর অসুখ-বিসুখ—

দীপ্তি বললে, শৈলেন! কোন্ শৈলেন?

কেন, যুগলবাবুর ভাইপো শৈলেন?

ওঃ—হ্যাঁ। দীপ্তি চুপ করে গেল!

তারপর কয়েক পা এসে ভদ্রলোক বললেন, এই যে—পাশের দরজা,—তুমি ভেতরে যাও মা, ওরা আছে সবাই—

ভদ্রলোককে নমস্কার জানিয়ে দীপ্তি ভিতরে ঢুকলো। এবার সে যেন অনেকটা চিনতে পারলো। তবে একদা আলো-হাওয়া আর পরিচ্ছন্নতা ছিল এই প্রবেশ-পথটায়, কিন্তু এখন অগণ্য ইমারতের চাপে আলোবায়ুহীন হয়ে ঘুটঘুট্টি হয়ে উঠেছে। যে উৎসাহ নিয়ে দীপ্তি এসেছিল, এখন আর সে উৎসাহ তার নেই! এখানে আসবার এমন কিছু দরকার ছিল না তার—হঠাৎ এসে পড়েছে এই মাত্র। এখনো ফিরে গেলে কেউ কিছু বলতো না!

পা চলছে না তার,—খোলা উঠোন যেটা ছিল, সেখানে এখন ছোট ছোট ঘর। অসংখ্য অপরিচিত নরনারী এক একটি খোপ আশ্রয় করে রয়েছে। অর্ধনগ্ন বুভুক্ষু শিশুরা, রুগ্ণা মেয়েরা, বাসাড়ে পুরুষের দল—তাদেরই মাঝে মাঝে এক একটি ছোট ছোট উনুন জ্বলছে। থলে টাঙানো, কাঁথা শুকানো, ছেঁড়া কাপড় ঝোলানো,—তার নীচে কোথাও ভাত তরকারি ঢালা, কোথাও পচা মাছের গন্ধ, কোথাও নোংরা জমে উঠেছে অনেকদিনের। বাতাসটা বীভৎস!

দীপ্তি একজায়গায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলে, শৈলেনবাবুরা কোন্ ঘরে থাকেন?

এক বৃদ্ধা জবাব দিল, ওইদিকে যাও বাছা!

কে গা?

জানিনে। বাড়িওলার কেউ হবে!

ঘর ভাড়া চায় নাকি?

শুয়োরের খোঁয়াড়ে আর জায়গা কোথায়?—কলতলার ধার থেকে একটি লোক গলা বাড়িয়ে মন্তব্য করে।

একজন বলে, বড় ঘরের মেয়ে। শাড়ির কী বাহার।

একটি মেয়ে বড় বড় চোখ করে বলে, ওর গায়ে আতরের গন্ধ, মা! আর, কী সুন্দর দেখতে!

দীপ্তি ততক্ষণে ভিতর দিকে চলে গেছে।

অবশেষে ঠিক জায়গাটিতে এসে দীপ্তি দাঁড়ালো। তাকে দেখে একটি রোগা বউ এগিয়ে প্রশ্ন করলো, কোত্থেকে আসছেন?

সিল্কের রুমাল দিয়ে কপাল মুছে দীপ্তি হাসিমুখে বললে, বললে কি চিনবেন? আমি অনেক দূরের মানুষ!

কা'কে চান বলুন না?

শৈলেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

বউটি তাকালো দীপ্তির দিকে। তারপর বললে, তিনি একটু আগে আপিস থেকে ফিরেছেন।

আপনি তাঁর স্ত্রী বুঝি?

হ্যাঁ।

দীপ্তি হেঁট হয়ে বউটির পায়ের ধূলো নিল। বউটি বললে, চিনতে পারলুম না ত? আসুন,—তিনি শুয়ে পড়েছেন—ডেকে দিই।

বউটি চলে গেল। পাশের কোন্ ঘর থেকে কাশির শব্দ আসছে। অত্যন্ত কঠিন যন্ত্রণাদায়ক একঘেয়ে কাশির

আওয়াজ। কোথায় যেন মেয়ে-পুরুষে ঝগড়া বেধেছে—মাঝে মাঝে অশ্লীল কুশ্রী কটূক্তি ছুটে এসে কানে বিঁধছিল। এখানে দাঁড়ানো যায় না, বউটি ওকে বসতে বলেনি, অভ্যর্থনা জানায়নি। সমস্তটা মিলিয়ে দারিদ্র্যের কেমন 'একটা নিষ্ঠুর বৈরাগ্য নিস্পৃহভাবে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

একটু পরেই শৈলেনবাবু এসে উপস্থিত হ'লেন। বউটি হাতে একটি লণ্ঠন নিয়ে এসে দাঁড়ালো। শৈলেনবাবু একটু বিব্রতভাবেই যেন বললেন, ঠিক চিনতে পারছিনে ত?

দীপ্তি সহাস্যে বললে, চিনতে না পারলে এখনই চলে যাবো!

স্ত্রীর দিকে শৈলেনবাবু একবার তাকালেন। পরে বললেন, বাড়িতে এসেছেন,—আসুন, বসবেন। কিন্তু কই আপনাকে ত আগে দেখিনি!

একটি ছোট বুকচাপা ঘরে এসে দীপ্তি বসলো। অসংখ্য ভাঙা জিনিসপত্রের ভিড়ে ঘরখানার দম যেন বন্ধ। একপাশে একটি আঁতুড়ে শিশু, এধারে ছেঁড়া লেপ আর ময়লা তোষকের কটু গন্ধে নিশ্বাস নেওয়া দুঃসাধ্য। নীচের তলা থেকে ধোঁয়া উঠে এসে ঘরের ভিতরটা যেন কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

বউটি অবাক হয়ে এই নবাগতা সুসজ্জিতা সুন্দরীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। শৈলেনবাবু বললেন, আপিস থেকে ফিরে একটু শুয়ে না পড়লে পারিনে! প্রায় রোজই জ্বর হয়। কিন্তু আপনি কে?

দীপ্তি অন্যমনস্কভাবে বললে, বাড়িটার চেহারা অনেক বদ্‌লে গেছে। নীচে ওরা কারা? অত নোংরায় থাকে কেন?

ওরা সবাই ভাড়াটে। তবে ভাড়ার টাকা আমরা ত আর পাইনে,—বাড়ি আমাদের বিক্রি হয়ে গেছে অনেককাল।

আবার সেই কাশির শব্দ। এবার যেন আরো কাছাকাছি। ভাঙা গলায় কেমন একটা আর্তস্বর, যেন বহুদিনের উপবাসী। দীপ্তি বললে, ও কে?

শৈলেনবাবু বললেন, ও আমার এক মামাতো ভাই—

অসুখ বুঝি?

ওর অসুখ তেমন কিছু নয়, তবে আমার মেজভাইটি বড্ড ভুগছে।

কিয়ৎক্ষণ চুপচাপ। তারপর দীপ্তি বললে, এবার আমাকে চিনতে পারছেন? ভালো করে চেয়ে দেখুন ত?

সহাস্যে শৈলেনবাবু বললেন, ক্ষমা করবেন, আপনাকে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। আপনি কি ঠিক আমাকেই খুঁজতে এসেছিলেন?

দীপ্তি হাসিমুখে বললে, যদি চিনতে না পেরে থাকেন তাহ'লে চ'লে যাবো, কেননা আমার পরিচয় দিলেও আপনি চিনবেন না।

শৈলেনবাবু বললেন, আপনি কি আগে আমাকে চিনতেন? কত বছর আগে বলুন ত?

দীপ্তি বললে, তা প্রায় চোদ্দ বছর হোলো বৈ কি। অবিশ্যি আপনি আমাকে দেখছেন আঠারো বছর পরে।

বউটি এবার ভিতরে এসে দাঁড়ালো। বললে, কোনো কাজে এসেছেন কি ?

দীপ্তি জবাব দিল, না, কাজ কিছু নয়। তবে অনেক বছর পরে দেশে ফিরলুম কিনা,—এখন আর কিছু চেনবার যো নেই।

শৈলেনবাবু বললেন, যুদ্ধের সময় কোথায় ছিলেন ?

দীপ্তি বললে, সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়াতে ছিলুম। যুদ্ধ আমরা টের পাইনি।

মানে ?

প্রায় চোদ্দ বছর আগে আমার কাকা সেখানে এক ছোট্ট সামন্ত রাজ্যে চাকরি নিয়ে চলে যান—আমরা ছিলুম পাহাড়ের কোলে এক গ্রামে, ছোট্ট নদীর ধারে—

সেখানে যুদ্ধের খবর যেতো না ?

কাকা খবর পেতেন একটু-আধটু, আমরা কিছুই পেতুম না।

খবরের কাগজে ?

দীপ্তি বললে, রাজবাড়িতে নাকি কাগজ আসতো, আমরা জানতুম না। খুব আনন্দে আমাদের দিন কাটতো।

বাইরে ছেলেমেয়েরা চেঁচামেচি করছিল। বউটি বোধ করি তাদের থামাবার জন্যে তাড়াতাড়ি চলে গেল। শৈলেনবাবু বললেন, আপনি এমন একটা দেশের খবর দিচ্ছেন, যেটা আমাদের কাছে স্বর্গ !

দীপ্তি বললে, স্বর্গ! কেন বলুন ত?

শৈলেনবাবু বললেন, এখানকার নরকে আপনাদের কিলবিল করতে হয়নি, এই আপনাদের সৌভাগ্য।

দীপ্তি বললে, আপনি বিয়ে করেছেন কদ্দিন?

তা প্রায় বছর বারো হোলো।

ছেলেপুলে?

শৈলেনবাবু বললেন, গত মাস পর্যন্ত ছয়টি ছিল, এমাসে পাঁচটি।

দীপ্তি তাঁর মুখের দিকে তাকালো। শৈলেনবাবু বললেন, খুব দুঃখিত হইনি। কোলের মেয়েটি আধ সের করে দুধ খেতো, সেই খরচটা এখন আমার বাঁচে।

আপনার বয়স কত এখন?

শৈলেনবাবু বললেন, আমার ধারণা ছত্রিশ, কিন্তু বন্ধুরা বলে, আমি নাকি বয়স লুকিয়ে বেড়াই। তারা বলে, আমার বয়স ছাপ্পান্ন!

মৃদুকণ্ঠে দীপ্তি বললে, আমিও তাই বলি!

এমন সময় বছর দশেকের একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো। বললে, বাবা!

মুখ বিকৃত করে শৈলেনবাবু বললেন, কি?

তুমি ডাক্তারের ওখানে যাবে না?

না, ডাক্তার গুলে খাওয়ালেও ওর কিছু হবে না,—যা তুই।

মেয়েটি চলে যাবার পর দীপ্তি বললে, কার অসুখ?

শৈলেনবাবু বললেন, আমার স্ত্রী ব'লে যিনি পরিচিত—তাঁর ! ওই যাকে দেখলেন এতক্ষণ।

কি হয়েছে ?

প্রত্যেক গরিব কেরানির বৌরা যেসব অসুখে ভোগে··· সেই সব। তবে আশ্চর্য কি, জানেন ? বাঁচবে ঠিক।

কেমন করে জানলেন ?—দীপ্তির করুণ চাহনি উৎসুক হয়ে উঠলো।

শৈলেনবাবু বললেন, ঠিকই বাঁচবে। ওরা যে বাঙালীর মেয়ে—ইস্পাতে গড়া। দারিদ্র্যে গ'লে যাবে, কিন্তু হঠাৎ ভাঙবে না। কঠিন প্রাণ ওদের।

দীপ্তি চুপ করে রইলো। হঠাৎ আবার ওঘর থেকে সেই হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ভয়ানক কাশির আওয়াজ। সে রুমাল দিয়ে মুখখানা আর একবার মুছে নিল। এই গলিতে ঢুকে পর্যন্ত বুক ভ'রে একবারও সে নিশ্বাস নেয়নি, কোথায় যেন সেটা বেধে গেছে। এক সময়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে বলে, এত লোক আপনারা এক বাড়িতে থাকেন ?

শৈলেনবাবু বলেন, লোক অবিশ্যি বেড়ে গেছে। আগে এত বড় বাড়িতে থাকতো জন কুড়ি,—এখন ভাড়াটেদের সব মিলিয়ে প্রায় সত্তর জন। দু'বছর আগে ম্যালেরিয়ায় মরেছে ন'জন,—গেল বছর কলেরায় দু'জন—। এ বছর জেনে রেখেছি কে কে যাবে।

দীপ্তি তাঁর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। শৈলেনবাবু

বললেন, আমার মেজভায়া কাজ পেয়েছিল এক কারখানায়, এখন আর কাজটা নেই। কিন্তু কাজ না থাকলেও কাশির ব্যামো থাকবে না কেন। ওটা যে কোন্ জাতের কাশি তাও জানি। সন্ধ্যের পর নিরেনব্বই ডিগ্রি জ্বর ওঠে।

উনি চুপ করে আছেন?

শৈলেনবাবু বললেন, তা, না থাকবে কেন? পয়সা ধার করে সোজা বাজারের দিকে যায়। লুকিয়ে মাখন আর ডিম কিনে খায়। হঠাৎ খেতে আরম্ভ করে দামী জিনিস। কিন্তু এমন দিনও আসে, লিভার যখন আর ভালো জিনিস নিতে চায় না।

দীপ্তি প্রশ্ন করলো, আপনার মেজভাইয়ের স্ত্রী কোথায়?

ঈশ্বর তাকে অনুগ্রহ করেছেন।

মানে?

শৈলেন বললেন, গত বছর একটি শিশু প্রসব করে সেই দেড় টাকা দামের হাসপাতালের বিছানাতেই মারা যায়। আর সেই শিশু ছেলেকে আমরা এক জায়গায় বিলিয়ে দিয়ে আসি।

দীপ্তি কিয়ৎক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর এক সময়ে বলে, মনে করেছিলুম আপনারা খুব আনন্দেই আছেন। অ[illegible] পরে তাই কলকাতায় এসে আপনাদের দেখতে ইচ্ছে হোলো। কিন্তু এখানে এসে—

বাইরে পায়ের শব্দ হোলো। শৈলেনবাবুর স্ত্রী এসে আবার দরজার কাছে দাঁড়ালেন। দীপ্তি এতক্ষণ পরে ভালো করে তাকালো তাঁর দিকে। মুখখানা ফোলা-ফোলা,—ওটা রক্তহীনতার

চিহ্ন। চেহারা কঙ্কালের মতো, সুদীর্ঘকাল অখাদ্য ভোজন আর অতিপ্রসবের ফলে যেমন চেহারা দাঁড়ায়—ঠিক তেমনি। বউটি যেন হাঁড়ির ভিতর থেকে আওয়াজ করলো, আপনাকে একটু চা দেবো ?

দীপ্তি বললে, না বৌদি, চা আমি খাইনে।

বৌদি বললেন, এবার আপনাদের চেনাচিনি হয়েছে ?

শৈলেনবাবু বললেন, না, অনেক চেষ্টা করেও ওঁকে মনে পড়ছে না।

মনেই পড়লো না, অথচ ত্বঘণ্টা ধরে আলাপ চললো ? এটা ত ভারি মজার ব্যাপার দেখছি !—বৌদি বিস্মিতভাবে উভয়ের দিকে তাকালেন।

দীপ্তি বললে, আমার কাকার নাম সুধীর রায়। মনে পড়ছে ?

শৈলেন বললেন, না। এ নাম শুনিওনি কখনো।

আচ্ছা দাঁড়ান,—আপনার ছোট পিসিমা কোথায় বলুন ত ?

ছোট পিসিমা ?—শৈলেন বললেন, আমার এক পিসিমা এখানে ছিলেন বটে তবে তাঁকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে হয়েছে।

দীপ্তি মুখ তুলে তাকালো।

বউটি বললে, কেন তুমি এত বাজে কথা আলোচনা করছো ?

শৈলেন হেসে বললেন, যে কলঙ্কটা আজকাল অনেক ঘরে সত্যি, সেটা প্রকাশ করাই উচিত। পিসিমা মাঝ-রাত্তিরে

উঠে কয়লা চুরি করতেন ওঘর-সেঘর থেকে,—একদিন ধরা পড়ে যান—

কয়লা চুরি !—দীপ্তি অবাক হয়ে তাকালো।

কয়লা চুরি, ভাত চুরি, ওষুধ চুরি ! নীচেকার ভাড়াটেরা আবার এঘর-ওঘর থেকে রাঁধা তরকারিও চুরি করে খায়।

দীপ্তি এবার আর হাসি চাপতে পারলো না। কিন্তু তার সেই সুন্দর হাসি দেখেও শৈলেনবাবু বললেন, সেদিন পাশের বাড়ির একটি মেয়ে ওপাশের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল।

কেন ?

ধুতি চুরি করে আনতো মেয়েটা, সেই ধুতি পাঠাতো দোকানে। তারা ছাপা রঙীন শাড়ি বানিয়ে দিত। এখানে চুরি বড় নয়, ধরা পড়া বড় নয়—ভদ্রঘরের মেয়ের পক্ষে লজ্জা নিবারণের চেষ্টাটাই বড়। কত নীচে নামিয়েছে আজ, কত যে ছোট করে দিয়েছে !

শৈলেনের স্ত্রী এই অপমানজনক গল্পের সামনে আর দাঁড়াতে পারলেন না,—মুখ ফিরিয়ে নিজের কাজে চলে গেলেন।

বুঝতে পারা যায়, এই মেয়েটি আসার জন্য আশেপাশে কতখানি কৌতূহল-কানাকানি চলছে। কেউ উঁকি দিচ্ছে, কেউবা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে। কারো পরনে গামছা, কেউ পরেছে লুঙ্গি, কেউ বা ছেঁড়া বিছানার চাদর জড়িয়ে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। যে দু'তিনটে ছেলেমেয়ে

নিতান্তই উলঙ্গ, তারা ধমকের ভয়ে সামনে আসতে সাহস করছে না।

নতমুখে দীপ্তি কিয়ৎক্ষণ বসে রইলো। পরে মুখ তুলে বললে, এমন করে কতদিন চলবে আপনাদের?

শৈলেন হেসে বললেন, সামনের চৈত্রমাস পর্যন্ত।

তারপর?

আশা করে আছি কলেরা আর বসন্ত এবার সবাইকে এক-সঙ্গে ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাবে। মুস্কিল হবে, যদি কেউ বেঁচে থাকে।

উত্তেজিত হয়ে দীপ্তি বললে, এর কি কোনো প্রতিকার করতে পারেন না?

শৈলেন ভ্রূকুঞ্চন করে বলেন, প্রতিকার মানে?

মুখ বুজে সমস্ত সহ্য করবেন? প্রতিবাদ করবেন না? মাথা তুলে দাঁড়াবেন না?

শৈলেন বললেন, ক্ষমা করবেন, আপনার উচ্ছ্বাসের কোনো দাম নেই। এক যুগ সহ্য করে, পরের যুগ উঠে দাঁড়িয়ে মারে। প্রতিকার কী শুনি? রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করবো?

বিপ্লব বাধিয়ে তুলুন! আগুন জ্বালান! ভেঙে-চুরে দিন।

অত্যন্ত চটকদার কথা!—শৈলেন বললেন, আপনি মেয়ে-গোয়েন্দা কি না, এখনও বুঝতে পারছিনে। আপনি আমার অপরিচিত। এখানে কেউ আপনাকে চেনে না, আপনার পরিচয় জানে না। এতটা ঘরের খবর সংগ্রহ করে কী লাভ আপনার তাও বুঝতে পারছিনে। আপনি আমার ঘরের মধ্যে এসে

বসেছেন, আত্মীয়তা করবার চেষ্টা করছেন—আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে সম্ভ্রান্ত ঘরেরই মহিলা। অথচ আপনার মতলব যে ঠিক কি, এখনও বুঝতে পারছিনে। এখন আবার বিপ্লব আর রাজনীতির কথা তুলছেন। তবে শুনুন বলি। খবরের কাগজের দাম দু'আনা—মাসে তিন টাকা বারো আনা—সুতরাং কাগজ পড়া আমার সাধ্য নয়। আর বিপ্লব? ওটা এখন ইস্কুলের ছেলেদের মুখের বুলি। আমার স্ত্রীর সূতিকা, আমার সর্দিজ্বর লেগেই আছে, ছেলেমেয়েগুলো খেতে পায় না, বন্ধুবান্ধবের কাছে ধারে মাথা বিকিয়ে আছে,—তা ছাড়া রেশনের কাঁকরমণি চাল, তেঁতুলবিচির গুঁড়ো মেশানো আটা, সরষের গন্ধ মেশানো রোপ অয়েল, ভেজিটেবল ঘি স্বপ্নেও খাইনে, দুধ মানে সাদা রং ধরানো জল,—এ সবের পর বিপ্লব! আপনি কি আমার মনে মিথ্যে উত্তেজনা এনে পুলিশে ধরিয়ে দিতে চান? তার চেয়ে কলেরা বসন্তের মড়কে যদি যেতে পারি, সেই ভালো। সে বরং মরে বাঁচবো।

এমন সময় শৈলেনের স্ত্রী একটি কলাইয়ের থালা আর এক গ্লাস জল নিয়ে এসে দাঁড়ালেন। শৈলেন বললেন, কী ওটা?

স্ত্রী বললেন, নতুন মানুষ এসেছেন বাড়িতে, আমাদের ভাগ্য। সামান্য একটু মিষ্টিমুখ করে যান।

শৈলেন বললেন, রাখো ওইখানে। এবার বুঝি খাবারের দোকানে ধার করতে আরম্ভ করেছ?

তোমার অত কথার দরকার নেই।—স্ত্রী রাগ করে বললেন, ওঁকে বকিয়েছ অনেকক্ষণ।—আসুন, একটু মিষ্টিমুখ করুন।

দীপ্তি বললে, আবার এত কষ্ট করে আনালেন বৌদি ?

তা হোক। একটু মুখে দিন।

শৈলেন বললেন, নীচে অত হট্টগোল কিসের ?

স্ত্রী জবাব দিলেন, সুষমার দেওর আপিস থেকে ফিরে রক্তবমি করছে।

রক্তবমি !—দীপ্তি যেন শিউরে উঠলো।

শৈলেন বললেন, আনন্দের কথা। তাহ'লে শরীরে ওর এখনো রক্ত আছে। বেচারীর চাকরিটা যাবে এই দুঃখ।

এ মাসের মাইনেটা পাবে না, তাই ওর বউ কান্না নিয়েছে। —বলে শৈলেনের স্ত্রী বেরিয়ে চলে গেল।

শৈলেন বললেন, এর পর খেতে ইচ্ছে করবে আপনার ?

দীপ্তি বললে, বৌদিদির অনুরোধ অমান্য করতে পারবো না। —এই বলে সে মিষ্টান্নের থালার দিকে অগ্রসর হয়ে এলো।

শৈলেনবাবু একবার এদিক-ওদিক তাকালেন। তারপর সহসা অগ্রসর হয়ে এসে জলখাবারের থালাটি দীপ্তির মুখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে বললেন, আমার ছেলেমেয়েরা ছ'মাসের মধ্যে দোকানের ভালো খাবার খেতে পায়নি। এ খাবার তারাই খাবে। আপনারা সুখী, ভোগী—দু'আনার মিষ্টি আপনার না খেলেও চলবে।

দীপ্তি হাসিমুখে তাকালো। বললে, এটিই কি একমাত্র কারণ ?

আর একটা কারণ আছে। এই নরককুণ্ডের কোনো খাত্ত আপনার মুখে না ওঠে। এখানকার ছোঁয়াচ আপনাকে লাগতে আমি দেবো না। এখানকার হাওয়ায় মৃত্যুর বীজাণু ভেসে বেড়ায় দিনরাত।

দীপ্তি আড়ষ্টভাবে একবার ঘরের বাইরে তাকালো। তারপর বললে, আচ্ছা, এবার আমি উঠি। রাত্তির হয়েছে। আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। দয়া করে আমাকে গলির পথটা দেখিয়ে দিন।

হ্যাঁ—চলুন। বলে শৈলেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

ঘরের বাইরে এসে দীপ্তি বললে, বৌদিকে বলে যাওয়া হোলো না।

শৈলেন স্পষ্টকণ্ঠে বললেন, আপনি আমাদের কাছে এতই অপরিচিত যে, লৌকিকতার কথাই ওঠে না। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কি বলুন ত?—দীপ্তি হেসে তাকালো।

আমার স্ত্রী যে আপনার আলাপে আর আচরণে খুব খুশি হয়েছেন, এ না-ও হ'তে পারে। গরিবের আঁস্তাকুড়ে কোনো বড়ঘরের মেয়ের পক্ষে এসে দাঁড়ানোও গরিবের পক্ষে অপমান। —আস্থন, একটু সাবধানে নামবেন।

আশপাশে সবাই উদগ্র ব্যাকুলতায় ঝুঁকে পড়েছে। রুগ্ণ, অথর্ব, জরাগ্রস্ত, ক্ষুধাতুর—সকলে এসে দাঁড়িয়েছে ওই সঙ্কীর্ণ পথের দুধারে। ওরা চোখ ভরে দেখে নিচ্ছে একটি স্বাস্থ্যবতী সুশ্রী মেয়েকে, মন ভরে লেহন করে নিচ্ছে একটি সৌন্দর্য-

স্বরূপিণীকে—ওদের বাসনা, ওদের কামনার আর অন্ত নেই। নোংরায় আবর্জনায় দুর্গন্ধে দারিদ্র্যে অপমানে ওরা সবাই ছোট ছোট খোপের মধ্যে কিলবিল করছে। ক্ষণকালের জন্য ওদের চোখের সামনে দিয়ে একটি আলো সরে যাচ্ছে,—তারপরে একে একে ওরা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'তে লাগলো।

দরজার কাছে এসে দীপ্তি বললে, গলিটা বড় অন্ধকার।

শৈলেন তখনই জবাব দিলেন, কণ্ট্রোলের কেরোসিন,——আলো দেখাবার মতো সংস্থান আমাদের নেই। বরং দেওয়াল ধরে ধরে হাঁটুন।

চোখ-বন্ধ গলিপথের বাইরে এসে দীপ্তি হাঁপ ছাড়লো। এতক্ষণ যেন একটা গুহা-গহ্বরের মধ্যে সে প্রবেশ করেছিল। এবার সহজ কণ্ঠে সে বললে, আমি বোধহয় অচেনাই রয়ে গেলুম?

সম্পূর্ণ!

দীপ্তি হাসলো। হেসে বললে, তবে এসেছিলুম কেন?

শৈলেন বিদ্রূপ করে বললেন, গরিবদের জীবনযাত্রায় অনেক মজা আছে, সেটা উপভোগ করতে অনেকের ভালোই লাগে। অনেক লোকে সখ করে হাসপাতাল দেখতে যায় বৈ কি!

দীপ্তি বললে, বৌদি আমার কথাবার্তায় খুশি হননি—একথা কি সত্যি?

মেয়েমানুষের মনের কথা মেয়েমানুষই বোঝে!

কিন্তু আমাকে দেখে আপনি কি একটুও খুশি হননি?

বিন্দুমাত্র না।—শৈলেন জবাব দিলেন।

দীপ্তি বললে, আঠারো বছর পরে আমি যে আপনাকে খুঁজে বার করেছি, এর জন্যে ছোট্ট একটু ধন্যবাদ ?

শৈলেন একটু থেমে বললেন, খুঁজে আমাকে পাওয়া গেল, এজন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

কথা কইতে কইতে ওরা এসে পড়েছে পার্কের ধারে। সেখানকার রেলিংয়ের পাশে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে দীপ্তি বললে, কেন ?

শৈলেন বললে, আমার অপমানিত চেহারাটা তুমি না-ই দেখতে ?

দীপ্তি বললে, আমি জানতুম না, এত যে বদ্‌লেছে সব—কিছুই জানতুম না। একদিন তোমার বয়স ছিল কুড়ি-একুশ, আমার সতেরো-আঠারো,—সেদিনকার সেই আগুন-ঝরা দিন, আর জ্যোৎস্নায় কাঁদানো রাত!

শৈলেন বললে, তুমি বিয়ে করোনি কেন ?

দীপ্তি বললে, সময় পেলুম কোথায় ? ডাক্তারি পাস ক'রে চাকরি নিলুম, সেই থেকে বিদেশে-বিদেশেই ঘুরছি।

কিন্তু বিয়ে করতে লাগে মাত্র একটা দিন।

দীপ্তি হেসে বললে, তা জানি। তবে বিয়ে করবো কি না একথা ভাবতে একটা জীবনও কেটে যায়।

শৈলেন হেসে বললে, হঠাৎ এই গরিব বেচারীকে মনে পড়লো কেন ?

দীপ্তি বললে, খেয়াল হঠাৎই হয়। কলকাতায় আসতে হোলো সরকারী কমিশনে। ভাবলুম তোমাকে খুঁজে বার করা যাক্। এমনি—যাকে বলে কৌতূহল। মন্দ কি, দেখা হয়ে গেল। কালকেই আমাকে চলে যেতে হবে।

পথের দিকে তাকিয়ে শৈলেন বললে, তোমার রাত হয়ে গেল দীপ্তি।

হ্যাঁ, এই যাই—ওই যে ট্রাম আসছে—আচ্ছা, ঘরে বসে আমাকে তুমি চিনতে চাইলে না কেন বলো ত ?—দীপ্তি বাঁকা চোখে তাকালো।

শৈলেন বললে, আগে বলো আমাকে তুমি খুঁজে বার করতে পেরেছ কি না ?

দীপ্তি বললে, না, সম্পুর্ণ পারিনি। ফুঁ দিলে তোমার মধ্যে এখনো আগুন পাওয়া যায়, কিন্তু ছাইগুলো আমারই মুখে লাগে।

শৈলেন বললে, যাবার আগে একটা অনুরোধ জানাবো।

কি ?—দীপ্তির কণ্ঠে ঔৎসুক্য ঘনিয়ে ওঠে।

আর কখনো আমাকে খুঁজো না। খুঁজলেও পাওয়া যাবে না।

দীপ্তি বললে, সে আমি জানি। কবরের মাটি খুঁড়ে যাকে পেলুম সে বেঁচে নেই।

শৈলেন যোগ করে দিল, আঠারো বছর আগে সেই অভিমানী ছোকরা কি যেন চেয়েছিল, কিন্তু পায়নি। বছর বারো আগে বিয়ের ফাঁস গলায় দিয়ে সে আত্মহত্যা করেছে।

জবাব একটা কিছু ছিল দীপ্তির অধরের কিনারায়, কিন্তু ট্রাম এসে পড়েছিল,—তাড়াতাড়ি সে গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লো।

শৈলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো একদৃষ্টে পথের দিকে চেয়ে। এক সময় পকেট থেকে একটা বিড়ি বার করে মুখে দিয়ে সে টানতে লাগলো। ছয়টি সন্তানের পিতা সে, একটি বর্ষীয়সী নারীর স্বামী সে,—এবং চল্লিশ বছরের প্রৌঢ়ত্বে এসে পৌঁচেছে। প্রাচীনকালের একটা ছেলেমানুষি নিয়ে লোফালুফি করা তার পক্ষে এখন বেমানান।

দূরের পথের দিকে একাগ্রচক্ষে তাকিয়ে বার বার বিড়ি-টানার পর তার হুঁশ হোলো, বিড়িটা সে এখনো ধরায়নি। হঠাৎ বিরক্তি আর অস্বস্তিতে তার মুখখানা বিকৃত হয়ে আসে—তারপর বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে হন্ হন্ করে বাড়ির দিকে চলতে থাকে।

কবরের তলা থেকে

ছেলেটাকে অনেক কষ্টে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। আসল কথা এই, আজকাল ভালো পাত্রের সন্ধান পাওয়া বড় কঠিন। যার বিদ্যেবুদ্ধি আছে, তার হয়ত তেমন সংস্থান নেই; আর যার বিষয়-সম্পত্তি কিছু আছে, সে খালি হাতে মেয়ে নিতে চায় না। দাদা বেশ জোর করেই বললেন, বুঝলে সরলা, হিরণ মিত্তির ভবিষ্যতের কথা একটুও ভাবেনি। রোজগার করেছিল কম নয়, কিন্তু মেয়ে দুটোকে লেখাপড়া শেখাতে গিয়ে দুহাতে খরচ করে গেছে। মেয়েরা যত কিছুই শিখুক, তাদের দিয়ে আদায় কিছু নেই।

সরলা নতমুখে পরলোকগত স্বামীর অপরিণামদর্শিতা স্মরণ করে দাদার মুখের ওপর আর কিছু বলেন না।

দাদা পুনরায় বললেন, ছেলেটা গরিবের ঘরের, লেখাপড়া তেমন কিছুই শেখেনি বটে। কিন্তু কাজ গুছিয়েছে ত! যুদ্ধের সময় ছেঁড়া কাগজের কারবার করে যাকে বলে দুহাতে টাকা লুটেছে।

মুখ তুলে সরলা বললেন, ছেঁড়া কাগজের! কি বলছো দাদা?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ—ছেঁড়া কাগজের! জঞ্জাল, নর্দমা, আঁস্তাকুড়, নোংরা গলিঘুঁজি—এই সব ঘেঁটে কুড়িয়ে আনতো ছেঁড়া কাগজ। তাই যেন চালান দিতো কোথায়! হাজার হাজার টাকা মেরেছে। পাঁচটা নামে ব্যাঙ্কে টাকা রেখেছে ইনকম ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্যে। ছেলে একেবারে তুখোড়। আরে বাপু,

বংশপরিচয় নিয়ে কি ধুয়ে খাবে! বাড়ি-গাড়ি নিয়ে রাজার হালে থাকবে, সে কি কম কথা! ওর মা-বাপকে আমি জানতুম—সে অনেক কালের কথা। সত্যি বলতে কি, ওরা হোলো ঘুঁটে-কুড়ুনের ঘর। ওর বাবা কাজ করতো হুঁরে সাধুখাঁর তেল কলে।

সরলা বললেন, অমন ঘরে মাধুকে দেওয়া কেমন হবে, দাদা!

দাদা বললেন, সে ঘর সেকালের সঙ্গেই চলে গেছে, সরলা। এ ছেলেটা একেবারে আনকোরা ঘর বানিয়ে তুলেছে। হঠাৎ উঠেছে মাটি কুঁড়ে যেন। টাকার পুঁটলি ওর এত উঁচু যে, আর সকলের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে! এ'কেই বলে মরদ। ভাগ্যের মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে সোনার খনির সন্ধান পেয়েছে। মাধুকে তুমি ওর হাতেই দাও, সরলা।

সরলা বললেন, ছেলেটির বয়স কত বলো ত?

দাদা বললেন, ওকথা না তোলাই ভালো। কষ্ট করে যাকে মানুষ হতে হয়েছে, আর যুদ্ধ করে যাকে প্রতিদিন বাঁচতে হয়েছে, সে-সব ছেলে বেশি বয়সেই বিয়ে করে। তোমার মেয়ে মাধুর বয়স কম হয়নি, প্রায় চব্বিশ; ছেলেটি প্রায় চল্লিশের দিকে এগিয়ে গেছে।

সরলা বললেন, ছেলেটি আর বোলো না—

আচ্ছা, ওই নাও, না হয় লোকটিই হোলো। আমি কেবল দেখলুম, লোকটা স্বাস্থ্যবান, আর দেখলুম তার বিষয়সম্পত্তি।

একটা কথা কি জানো সরলা, পুরুষমানুষ বেশি বয়সে বিয়ে করলে একেবারে পোষমানা জন্তু ব'নে যায়। তার ওপর এক-আধটা ছেলেমেয়ে হ'লে একেবারে দাসানুদাস। তখন চাবির গোছা আঁচলে বেঁধে তোমার মাধু পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাকবে।—দাদা নিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা মনে করে মাথা নাড়তে লাগলেন।

নিঃসম্বল বিধবা সরলা রাজি হয়ে গেলেন।

কথাটা কিন্তু মিথ্যে হয়নি। শ্বশুরবাড়িতে মাধু এসে দাঁড়ালো, কিন্তু এটা ঠিক শ্বশুরবাড়ি নয়—এটা স্বামীর বাড়ি, মানুষ মাত্র তারা দুটি—বাকি যারা আছে তারা বাইরের লোক। উপকরণ-বাহুল্যে সমগ্র বাড়িখানা পরিপূর্ণ, এবং সেই নিষ্প্রয়োজন উপকরণগুলির তদ্‌বির-তদারক করে জনচারেক চাকর—মাসে মাসে তারা মোটা মাইনে পায়, যুদ্ধের আগে সেটা পাঁচভাগের একভাগও ছিল না। কখন্ যে এ বাড়ির রান্না হয়, কারা যে মোটরগাড়িতে যখন-তখন আনাগোনা করে, নীচের তলায় কিসের যে হট্টগোল সকাল-সন্ধ্যায়—মাধুর পক্ষে এগুলো পর্যালোচনা করাও কঠিন। ফলে, এতবড় বাড়ির অনেকটা অংশ তার কাছে অনেক দিন অবধি অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। তবে একটা কথা নির্ভুল ভাবে সত্য এই যে, এ বাড়িতে সে নিতান্ত কনে-বৌ হয়ে আসেনি। তার চোখ এবং মনের চোখ দুটোই খোলা।

পরীক্ষাত্মক মনোবিজ্ঞান নিয়ে তাকে এম্-এ পড়তে হয়েছিল, তার পদক্ষেপ অতি সতর্ক সন্দেহ নেই। শিক্ষিত মেয়ে বলে আত্মাভিমানের কথা এখানে ওঠে না, কিন্তু সচেতন মনের স্বাভাবিক দীপ্তির দ্বারা সে সমস্তটা বিচার করতে জানে।

এই ধরা যাক না কেন, প্রথম দিকে একদিন রাত্রে কালীপদ তাকে বলেছিল, আমার একলা থাকতে ভয় করে।

মাধু স্পষ্ট প্রশ্ন করলো, কারণ কিছু খুঁজে পেয়েছ?

স্ত্রীর কণ্ঠস্বরে স্নেহের কোনো আবিলতা অনুভব করতে না পেরে স্বামী একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল। পরে সে জবাব দিল, তুমি কাছে থাকলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মাধু হাসিমুখে বললে, কাছে থাকার জন্যই ত বিয়ে হয়েছে; কিন্তু একলা থাকতে ভয় কেন তোমার?

প্রশ্নটিতে হয়ত স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক কৌতুকবোধ ছিল, কিন্তু কালীপদ ভুল বুঝলো। সে ধরে নিল তার চরিত্রের ওপর সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছে। সে বললে, তুমি বোধ হয় আমাকে ভালো লোক মনে কর না?

সে কি!—মাধু হেসে উঠলো, আমি কি তাই বললুম?

কালীপদ কিয়ৎক্ষণ যেন কিছু গম্ভীর হয়ে রইলো। পরে বললে, একটা কথা কিন্তু ঠিক তোমাকে বলতে পারি, নতুন-বউ।

মাধু অন্যমনস্ক হয়ে মুখ ফেরালো। কালীপদ বললে, অবিশ্যি বয়স আমার হয়েছে, একটু বেশিই হয়েছে, তবু

এটা বুঝতে পারি যে, এ জীবনে আমি কাউকেই বিশ্বাস করতে পারিনি।

আমাকে?

তোমাকে? তোমাকে বিশ্বাস করবো বলেই ত ঘরে এনেছি।

মুখের হাসি মুখের ওপর রেখেই মাধু বললে, তাহ'লে আমাকে খুব সাবধানে চলতে হবে বলো?

কালীপদ বললে, সে তুমি জানো।

পরের বাড়িতে এসেই লোকে সাবধানে আড়ষ্ট হয়ে চলে, তা জানো ত? এখানে তাহ'লে আমার পদে পদে পরীক্ষা, তাই না?

হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করে কালীপদ বললে, থাক্‌গে—যত বাজে কথা। তুমি বোধ হয় একটু বাঁকা পথে হাঁটতে ভালোবাসো।

মাধু বললে, বাঃ, আমাকে বুঝি ধমক দিয়েই পালাতে চাও? তা হবে না। তুমি কাউকেই বিশ্বাস করো না—তার মানে কেউই তোমার শ্রদ্ধার যোগ্য নয়।

তা হতে পারে।

কালীপদ আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে না। কোনো একটা কাজের অছিলা জানিয়ে একটু দ্রুতপদেই বেরিয়ে চলে যায়। এই দুদিন স্ত্রীর সঙ্গে তার বিতর্কের সৃষ্টি হোলো। সমস্ত বিতর্কের মধ্যেই সে কিন্তু নিজের আহত পৌরুষকে অনুভব করে। নতুন-বৌয়ের সামনে কিছুক্ষণ মুখোমুখি

দাঁড়ালে একটা অপরাধ-চেতনা তার নিজের মুখের ওপর ভেসে ওঠে। এই অস্বস্তিকর অবস্থাটা বরদাস্ত করে নিতে তার একেবারেই ভালো লাগে না। পরীক্ষাটা মাধুর অথবা তার নিজের—এ যেন বলা কঠিন। সে জানে সে শিক্ষিত নয়, শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারেনি; আজ সে বিত্তশালী হয়ে উঠলেও শিক্ষিত মহলে তার আদর কম, এ সে জানে। ফলে তার আক্রোশ দাঁড়িয়ে উঠেছে শিক্ষিতের বিরুদ্ধে, এবং সেই আক্রোশের পরিতৃপ্তির জন্য শিক্ষাবতীকে সে ঘরে এনেছে আপন খুশিতে পরিচালিত করার জন্য। শীর্ণকায় ব্যক্তি বাঘিনীকে শৃঙ্খলিত করে একপ্রকার আনন্দ পায়—তাকে পোষ মানিয়ে পায়ের তলায় পুষে রেখে উল্লাস বোধ করা যায় বৈকি। কিন্তু পোষ মানতে না চাইলে আক্রোশ এবং দুর্ভাবনা আসে।

কালীপদ দুর্ভাবনা নিয়ে ঘর করতে রাজি নয়।

মাধু সেদিন বললে, তুমি ত বেশ লোক দেখছি! সপ্তাহে একখানা করে গহনা তোমার দেবার ক্ষমতা আছে মানলুম, কিন্তু আমার গহনা নেবার কি যোগ্যতা আছে?

কালীপদ বললে, তুমি কি নিতে রাজি নও?

হাসিমুখে মাধু বললে, তুমি দিলে মাথায় করে নিতে হবে। কিন্তু এত দিচ্ছ কেন? এত নিতে আমার যে ভয় করে!

ভয়ের কিছু নেই। আমার এত টাকা আছে যে তুমি নিয়ে ফুরোতে পারবে না নতুন-বৌ।

তাই বলে তুমি দিয়ে যাবে, আর আমি নিয়ে যাবো? এই কি তোমার-আমার ভেতরকার সম্পর্ক?

কালীপদ বললে, তোমরা মেয়েমানুষ, গয়না-কাপড় না পেলে তোমরা খুশি থাকবে কেন?

মাধুর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। স্বামীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ শান্ত দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইলো। পরে বললে, আমি ছোট হতে পারি, লোভী হতে পারি, কিন্তু মেয়েদের ওপর তোমার এই মনোভাব অত্যন্ত অপমানজনক।

কালীপদ বললে, মেয়েদের তুমি কতটুকু জানো নতুন-বৌ?

মাধু ঈষৎ উষ্ণকণ্ঠে বললে, তোমার চল্লিশ বছরে অনেক মেয়েকে হয়ত তুমি জেনেছ,—হয়ত তারা তোমারই দেখার যোগ্য। কিন্তু ভুলে যেয়ো না, ভালো মেয়েও অনেক আছে।

কালীপদ ভেবে নিল, ঠিক জায়গাটিতে সে এতদিন পরে আঘাত দিতে পেরেছে। এই মনে করেই সে হো হো করে হেসে উঠলো। বললে, ভালো মেয়ে! মেয়ে আবার ভালো-মন্দ কী? মেয়ে হ'লেই হোলো। তুমি কি ভাবো লেখাপড়া শিখলেই মেয়েরা খুব উঁচুতে উঠলো?

মাধু বললে, লেখাপড়া শিখেও অনেক মেয়ে নীচুতে নামে, আবার অনেক অশিক্ষিত ছেলেও উঁচুতে উঠতে পারে। কিন্তু লেখাপড়া যদি কেউ না শেখে, তাতে গর্বের কিছু নেই!

তার মানে? আমাকে বলছো কিছু?

তুমি আমার অভিভাবক, তোমাকে কিছু বলা উচিত নয়।

আমি বলছি সব মেয়ে লোভী আর নোংরা নয় ; লেখাপড়া-না-জানা অনেক মেয়ে অনেক বড় হতে পারে। তোমার মা-ঠাকুমা শিক্ষিত ছিলেন না, তাই বলে কি তাঁরা ছোট ?

থাক্—কালীপদ বললে, তাদের নাম কোরো না। মা-ঠাকুমা হ'লেই যে মেয়েমানুষকে পূজো করতে হবে, তার মানে নেই। আমার হাড় জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খেয়ে তারা মরেছে ; চিরকাল আমার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করেছে।

গোয়েন্দাগিরি ! কেন ?—মাধু হাসবার চেষ্টা করলো।

কালীপদ বললে, অতি সোজা কথা ! সেই পুরনো কাশুন্দি ! আমার চরিত্র নাকি খারাপ, আমি নাকি পাড়ার মেয়েদের কাছে উড়োচিঠি পাঠাই—এই সব।

ও !—মাধু চুপ করে গেল।

কালীপদ ঠিক আঁচ করতে পারলো না, এই আলাপটায় মাধুর কোনো মনোবিকলন দেখা যাচ্ছে কি না। কিন্তু একথা ঠিক, হঠাৎ সিদ্ধান্ত করে এই প্রকার উচ্চশিক্ষিত মেয়েকে বিয়ে করে বসা তার পক্ষে উচিত হয়নি। একে মেয়ে, তার ওপর শিক্ষার পালিশ,—মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী—এদের মনের অলিগলিতে কত রকম যাদুবৃত্তি খেলে বেড়ায় তার হদিস পাবার উপায় নেই। বিয়ে করার আগে আর একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল। সবচেয়ে ক্ষোভের কথা এই যে, যুদ্ধের সময় কত সহস্র প্রকার ছলনার দ্বারা সে-যে প্রচুর টাকা রোজগার করেছে এবং লোকসমাজে তার-যে প্রচুরতর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তিলাভ

ঘটেছে, তার প্রতি এই স্ত্রীলোকটির যেন একটি প্রচ্ছন্ন অবহেলা দেখা যায়। সে-বার আসামের এক বিমানঘাঁটির এক আমেরিকান সাহেব তাকে ইংরেজিতে কতকগুলো কি বলেছিল, সে অবশ্য সবটা বুঝতে পারেনি,—কিন্তু তার মোট কথাটা হোলো এই, মেয়েরা হোলো পুরুষের খেলার সামগ্রী; যত খুশি বাজার থেকে খেলনা কিনতে পারো; খেলনা ভেঙে গেলে নতুন খেলাঘর আবার গড়ে নিতে পারো।—লোকটা পণ্ডিত সন্দেহ নেই।

সন্ধ্যাবেলাটা রসমধুর করার চেষ্টায় কালীপদ তাড়াতাড়ি কাজকর্ম সেরে এগিয়ে এসেছিল, কিন্তু সেটা বিসদৃশ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ায় তার মন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। একটু বক্রকণ্ঠে সে বললে, তোমার সেই মাস্টার মশাইটি আবার যে আজ এসেছিলেন গো!

মাধু চকিত হয়ে বললে, কে? প্রফেসর দত্ত? কোথায় তিনি?

আমি ভাগিয়ে দিয়েছি।

মাধু বড় বড় চক্ষে স্বামীর দিকে তাকালো।

কালীপদ বললে, এতদিন কিছু বলিনি। আজ বলতে বাধ্য হলুম, যিনি আপনার ছাত্রী তিনি এখন গেরস্তের বউ,—আপনার সঙ্গে বৈঠকখানায় বসে আড্ডা দিলে তাঁর মানসম্ভ্রম থাকবে কি?

কি বললেন তিনি?

বলবে আর কি! যেমন কুকুর তেমনি মুগুর! তুমি জানো না নতুন-বৌ, বড়লোকের বাড়ির আঁস্তাকুড়ে অমন অনেক জঞ্জাল এসে জড়ো হয়। দু' পাঁচ টাকা বখশিস পেলে খুব খুশি।

উনি ত কিছু চাইতে আসেন না?—মাধুর গলা ধরে এলো।

তুমি বোঝো না। হঠাৎ চায় না, আগে জমিয়ে বসে। তুমি এখন টাকাওলা লোকের বউ, লোকটা বেশ জানে। দেখোনি ছেঁড়া জামাকাপড় পরে আসে? ওই হোলো ওর বিজ্ঞাপন।

মাধু সহসা উঠে দাঁড়ালো। বললে, এ আলোচনা থাক্। তাঁর ওপর ভয়ানক অবিচার হচ্ছে।

কালীপদ বললে, তবে কি বলতে চাও লোকটা টাকা পাবার লোভে আসে না?

একেবারেই না!

তাহ'লে বলো আর কোনো মতলবে আসে?

মাধু বললে, বুড়ো মানুষ, গরিব মানুষ তিনি। তাঁর এক-মাত্র মেয়ে মারা যাবার পর আমার কাছে এসে কিছু সান্ত্বনা পান—তাঁকে তুমি একেবারে ভুল বুঝেছ।

কালীপদ এবার উচ্চকণ্ঠে বললে, মেয়ে মরেছে, তাই পরের ঘরের বউএর কাছে এসে সান্ত্বনা চাওয়া!

আমি তাঁর বিশেষ প্রিয় ছাত্রী ছিলুম। তিনি নিঃস্বার্থ নিরীহ লোক।

এ-সব তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলো?

স্পষ্ট সচেতন কণ্ঠে মাধু বললে, না, বলিনে—তুমি পৃথিবীতে

কারোকে বিশ্বাস করো না, তুমি নিজেই বলেছ। এ শুধু আমার নিজের কথা।

মাধু যাবার জন্য অগ্রসর হতেই কালীপদ বললে, কোথা যাচ্ছ ?

মাধু বললে, আমি এখনই লোক পাঠাচ্ছি মাস্টার মশাইয়ের কাছে, এ বাড়িতে আর যেন তিনি না আসেন।

কালীপদ চেয়ারটা ঘুরিয়ে বসে বললে, তোমার হুকুমে এ বাড়ির লোক কোথাও যাবে না, তা জানো ? তারা আমার পয়সা খায়।

মাধু থমকে দাঁড়ালো। কালীপদ বললে, তোমার বদ্‌মেজাজের কোনো দাম নেই, নতুন-বৌ। আমার একটা তুড়িতেই তুমি জল হয়ে যাবে। মেয়েমানুষের রাগ-অভিমান হোলো মেঘের রং—এই আছে, এই নেই—বুঝলে ? তার চেয়ে একটা কথা বলি শোনো।

চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে কালীপদ মাধুকে দু'হাত দিয়ে ধরবার চেষ্টা করলো, আকণ্ঠ ঘৃণায় মাধু তার হাতখানা ছাড়িয়ে দ্রুতপদে চলে গেল।

কালীপদ থমকে দাঁড়িয়ে পিছন থেকে উচ্চকণ্ঠে বললে, কিন্তু মনে রেখো নতুন-বৌ—যারা পায়ের নীচে থাকে তারা যেন ওপর-তলাকার লোকেদের সঙ্গে বিবাদ না বাধায়। তার ফলাফল ভালো নয়।

মাধুর কাছ থেকে কোনো জবাব এলো না।

কিন্তু অসুবিধা এই, ওরা হোলো স্বামী-স্ত্রী। বিসংবাদটা গিয়ে মনোমালিন্যে দাঁড়ালেও আবার সেখান থেকে কালীপদকে ফিরে আসতে হয়। তা ছাড়া, কালীপদর মধ্যে একটি হারমানা মনোভাব রয়ে গেছে। ভাগ্যের কোনো একটা চক্রান্তে হয়ত দু'হাতে অর্থসম্পদ্ আহরণ করা যায়, কিন্তু একটি ভদ্রমনকে জয় করা এ জীবনে বড়ই কঠিন। সে-মন সম্পদের প্রাচুর্যে অভিভূত হয় না, প্রলোভনের সহস্র উপকরণ চারিদিকে ছড়ানো থাকা সত্ত্বেও বশ্যতা স্বীকার করে না, কোনো প্রকার আসক্তির সাহায্যে তাকে আনন্দিত করে তোলা কঠিন। ফলে, আত্মাভিমান আহত হওয়ার জন্য হঠাৎ-ধনাঢ্য কালীপদ বার বার গরম হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু তখনই আবার নরম হয়ে মাধুর পিছনে পিছনে তাকে ঘুরতে হয়েছে।

মাধু একদিন বললে, একটি অনুরোধ রাখো, তোমার বিধবা জেঠিমাকে এ-বাড়িতে ফিরিয়ে আনো, ভাইবোনদের ডেকে নাও।

কালীপদ তপ্তকণ্ঠে বললে, তোমার এ-অনুরোধের মানে কি?

মাধু বললে, এতবড় বাড়ি, এতখানি ফাঁকা। তারা তোমার নিজের লোক, তাদের অবস্থাও ভালো নয়। তোমার এত আছে, তাদের মধ্যে কিছু ছড়িয়ে দিলে তোমার খুব ক্ষতি হবে না ত।

আমাকে আর এ-অনুরোধ তুমি কোরো না নতুন-বৌ।

তোমার এ আপত্তি কেন?

তারা আমার পুরনো জীবনের সাক্ষী, তারা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় লজ্জা। তাদের মুখ আর আমি দেখতে চাইনে।

মাধু বললে, তাই বলে তাদের ত্যাগ করবে ?

ত্যাগ ত দূরের কথা,—তারা আমার কেউ, এ আমি স্বীকারও করবো না। যেমন ভাঙা তেমনি ফুটো,— তলা ক্ষওয়া ! তারা কে আমার ? ছেঁড়া ময়লা তাদের জীবন - থাকে বস্তিতে, রাস্তার কলে তারা জল খায়, ঘুঁটে বিক্রি করে,—পান্তা ভাত গিলে বাসন মাজতে বসে সরকারী নর্দমার ধারে।—কালীপ্দ আকণ্ঠ ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করে বলতে থাকে—তাদের কথা আমার কাছে বোলো না, নতুন-বৌ ! তাদের কাছ থেকে আমি পালিয়ে বেঁচেছি, অপমান থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছি, তারা আমার ঠিকানাও জানে না।

ঠিকানাও জানে না ?

না, কোনো দিন জানতে দেবোও না। পুরনো জীবনের কোনো চিহ্নই এ বাড়িতে তুমি খুঁজে পাবে না, কোনো দাগ এখানে নেই। শুধু এ বাড়ি নয়,—আমার জীবনটাকেও ঢেলে সেজেছি। একেবারে নতুন, আনকোরা নতুন। এত চকচকে করে তুলেছি যে, নিজেরই চোখ ঠিকরে যায়।

মাধু সহাস্যে বললে, এ কি সম্ভব ?

টাকা থাকলে কী না সম্ভব ! টাকার স্রোতে পুরনো ময়লা ধুয়ে বেরিয়ে গেছে। একটা পুরনো আসবাব এ-বাড়িতে খুঁজে পাবে না, একখানা পুরনো ছবি পর্যন্ত রাখিনি, একটুকরো

কাগজও নেই। এবার বলো দিকি, আমি ঠিক যা হতে চাই তা হয়ে উঠেছি কি না?

কালীপদ আর একটু কাছে সরে এল। তার মাথায় সুগন্ধ তেল—কিন্তু অত্যন্ত কড়া সুগন্ধ, অনেক দূর থেকে যেন তেড়ে আসে নাকের মধ্যে। গলায় তার পাঁচনরী সোনার হার—সেটায় সোনার পরিমাণ প্রচুর। হাতে গোটা পাঁচ ছয় হীরে নীলা পান্না আর সবজে পোখরাজের আংটি, ডান হাতের বাজুতে সোনার শিকলে গড়া কবচ। পুরুষের শরীরের আর কোনো অংশে যদি অলঙ্কার পরবার সুবিধা থাকতো, কালীপদ সেই সুবিধা ছাড়তো না।

কালীপদ আরো কাছে সরে এসে সাদরে মাধুর একখানা হাত জড়িয়ে ধরলো। বললে, সত্যি করে বলবে কিন্তু এবার!

মাধু গলগলিয়ে হেসে উঠলো। হীরার আংটির মতো কালীপদর চোখ দুটো দপ দপ করে উঠেছে, এমন সময় বাইরে গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। মাধু সংযত হয়ে দাঁড়ালো। অধীর জড়িত কণ্ঠে কালীপদ বললে, ওদের গ্রাহ্য কোরো না, ওরা ঝি-চাকর! শোনো—শুনে যাও—

ছি! বলে মাধু সরে গেল—ছেলেমানুষি কোরো না।

চাকর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললে, বড়বাবু, আপনি নীচে গিয়ে একবার পায়ের ধূলো দিন—

চাকরের ভাষাটা দুরন্ত। মাধুর দিকে তাকিয়ে কালীপদ একটু হেসে বললে, কেন রে?

আপিস থেকে ছোটসায়েব বিশেষ দরকারে এসেছেন।

ছোটসায়েব! কেন, কি হয়েছে? চল্ তো—কালীপদ দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মিনিট পনেরো পরে কালীপদ হন্ত-দন্ত হয়ে উপরে উঠে এসে ডাকলো, নতুন-বৌ! নতুন-বৌ!

এ-ঘরে নেই, ও-ঘরে গেল কালীপদ। ডাকলো, নতুন-বৌ!

বারান্দা পেরিয়ে অপর একটা হল্-এ গিয়ে কালীপদ দেখলো, পাচকের সাহায্যে মাধু খাবারের টেবিল সাজাচ্ছে। কালীপদ বললে, শোনো শীগগির একটা কথা—

মাধু এসে বারান্দায় দাঁড়ালো। রুদ্ধশ্বাসে কালীপদ বললে, একটা কাজ করতে পারো?

মাধু তাকালো তার দিকে। কালীপদ বললে, তোমার নামে লাখ দেড়েক টাকা আমি সরিয়ে ফেলতে চাই। দরকার হ'লে তুমি বলবে টাকাটা তোমার।

মাধু বললে, কী বলছ তুমি!

হ্যাঁ, আমি কোনো একটা ব্যাঙ্কের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে দিতে পারবো, বছর খানেক আগেকার তারিখ দিয়ে তারা তোমার নামে খাতা তৈরি করে দেবে। তুমি শুধু বলবে, এ-টাকা তোমার বাপের বাড়ি থেকে বিয়ের যৌতুক দিয়েছিল।

কা'কে বলবো এ কথা?

ধরো,—পুলিশকে? লক্ষ্মীটি নতুন-বৌ,—আমি তোমার স্বামী—

মাধু কিয়ৎক্ষণ চুপ করে দাঁড়ালো। পরে বললে, কিন্তু আমি ত মিছে কথা বলিনে!

স্বামীর জন্যেও না? স্বামীর যদি জরিমানা হয়—স্বামী যদি জেল খাটে, যদি লোকসমাজে লাঞ্ছিত হয়—তবুও না?

মাধু বললে, তুমি স্বামী, তুমি পরম গুরু—আমাকে তুমি ক্ষমা করো। আমি কখনো মিছে কথা বলিনে।

কালীপদ কিছুক্ষণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইলো। পরে বললে, তুমি কি এতই বড়?

মাধু বললে, আমাকে ক্ষমা করো তুমি!

আচ্ছা থাক্—শোনো তবে, আমি এখনই দিল্লী রওনা হচ্ছি। প্লেনেই যাবো। ফিরবো শনিবার। এখনই আমার ব্যাগ বিছানা নীচে পাঠিয়ে দাও।—বলতে বলতে কালীপদ ঊর্ধ্বশ্বাসে চলে গেল।

মনোবিজ্ঞানের ছাত্রীটি চেয়ে রইলো পিছন দিকে। স্বামীকে সে জেনেছে বৈকি। কাজ-কারবারের চেহারাটা উপর থেকে দেখতে খুবই ছোট, কিন্তু ভিতরদিকে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গলোকের পথ দিয়ে কেমন করে যে টাকার স্রোত বয়ে আসে, সেটি রহস্যময়। জন-দুই সাহেব এবং জন-তিনেক অবাঙালীও এর সঙ্গে লিপ্ত আছে সে শুনেছে। সে-কথা ভাবতে গিয়ে মাধুর যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

দিন-দুই পরে নীচের থেকে চাকর এসে জানালো, সেই

বুড়ো মাস্টার মশাই এসে বসে আছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

মাধু বললে, প্রফেসার দত্ত এসেছেন বুঝি?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

একটু থম্‌কে মাধু বললে, তুই ওঁকে চলে যেতে বল্ গিয়ে, আমার সঙ্গে দেখা হবে না।—আচ্ছা শোন্!

চাকর ফিরে দাঁড়ালো। মাধু বললে, বল্ আমার খুব অসুখ—

আচ্ছা, মা।

পুনরায় চাকরের পিছনে পিছনে মাধু দৌড়ে এলো। ব্যস্ত হয়ে বললে, না না, শোন্—বল্ গিয়ে বাইরের লোকের সঙ্গে মা আর দেখা করেন না—ওঁর স্বামীর পছন্দ নয়! বল্‌বি, বুঝলি?

যে আজ্ঞে।

কিছুক্ষণ পরে চাকর ফিরে এসে বললে, একজন মেয়েছেলে ওঁর সঙ্গে এসেছেন—আপনার সঙ্গে না দেখা করলেই চলবে না—

অগত্যা মাধুকে যেতে হোলো।

পূর্বদিকের বাইরের ঘরে অন্তরঙ্গদেরই আনাগোনা। ঘরটি নিরিবিলি বলেই কথাবার্তা বলার সুবিধা। মাধু ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতেই বৃদ্ধ মাস্টার মশাই বললেন, এসো মা এসো—

একটি স্ত্রীলোক অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই দিকে একবার তাকিয়ে মাধু বললে, আপনাকে যে আমি চলে যেতে বললুম, মাস্টার মশাই?

বৃদ্ধ হাসলেন। বললেন, চলে যাবো! মায়ের মন্দিরে ঢুকে মাকে না দেখেই চলে যাবো! সে কি হয়!

মাধুর চোখে জল এসেছিল। সেই অশ্রু গোপন করার জন্য সে তাড়াতাড়ি মাস্টার মশাইয়ের পায়ের ধূলো নেবার জন্য হেঁট হোলো।

বৃদ্ধ বললেন, তুমি একটি ঝি চেয়েছিলে, তাই এই মেয়েটিকে এনেছি, মা। এতবড় বাড়িতে তুমি একলা থাকো—জামাইটি সব সময় থাকে না—এ মেয়েটি তোমার কাছে থাকবে। খাওয়া-পরা ছাড়া যা হয় হাতখরচ দিয়ো, মা।

স্ত্রীলোকটি নিঃশব্দে কাঠ হয়ে দেয়ালের গায়ে পিঠ চেপে দাঁড়িয়ে ছিল। মাধু জিজ্ঞেস করলে, বেশ ত।—তোমার নাম কি?

স্ত্রীলোকটির বয়স ত্রিশ-বত্রিশ অথবা বাহান্ন তা বোঝবার উপায় নেই। সে কেমন একপ্রকার বিশ্রী ভাঙা-গলায় বললে, শশী।

আর কোথাও কাজ করেছ?

একজায়গায় অনেকদিন ছিলুম।—স্থিরকণ্ঠে শশী জানালো।

আচ্ছা, তুমি থাকো আমাদের এখানে।

মাস্টার মশাই বললেন, শশী আমাদের পাড়াতেই থাকে। বড্ড গরিব। ওর দুটি মেয়ে ছিল, তার একটি মারা গেছে দুর্ভিক্ষের বছরে। মেয়েটি বড় শান্ত।

কৃতজ্ঞতায় মাধুর মন তখন ভরে উঠেছে। সে ফস করে

বললে, মাস্টার মশাই, আমার স্বামী এখন বাড়ি নেই,—আপনি কিছু টাকা নিয়ে যাবেন ?

টাকা ? কী বলছো মা !

বলছি, কিছু টাকা নিন্ না ? আপনার অবস্থা খারাপ, আমি বড়লোক···আপনি এখানে যাতায়াত করেন—আপনি গরিব—

মাস্টার মশাই শান্ত দৃষ্টিতে তাঁর অতি প্রিয় ছাত্রীটির দিকে তাকালেন। পরে বললেন, তোমার মতন যার মেয়ে সে ত গরিব নয় ? আজ তোমার মন ভালো নেই, মা। টাকা আমার কী হবে ? গরিবের ঘরে টাকা রাখবো কোথা ? আজ আমি উঠলুম মা—

মাস্টার মশাই উঠে দাঁড়ালেন। মাধু অধীর হয়ে বললে, বলুন আর কোনোদিন আসবেন না ?

মাস্টার মশাই হা হা করে হাসলেন। বললেন, দেখছো, শশী, কেমন আমার পাগলী মেয়ে ?

জলখাবারের থালা নিয়ে চাকর এসে ঢুকলো। মাধু প্রশ্ন করলো, খাবার কার জন্যে ?

চাকর তাকালো প্রফেসর দত্তর প্রতি। মাধু বললে, উনি কি খান্ এখানে কোনোদিন যে, ওই নরকে উনি হাত দেবেন ? যা এখান থেকে—

মাস্টার মশাই আবার হেসে উঠলেন। বললেন, স্বামীর ওপর কি রাগ করতে আছে মা ? স্বামী যে গুরু ! আচ্ছা, আসি মা। শশী, তুমি তবে রইলে এখানে। আমি চললুম।

মাস্টার মশাই লাঠিটি ধরে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। আবার চোখের জল চেপে শশীর দিকে তাকিয়ে মাধু বললে, এসো ভেতরে এসো—

সে গেল আগে, শশী ঢুকলো তার পিছু পিছু। কী ধিক্কার জমেছে মাধুর মনে পরিমাপ করা কঠিন। কী আত্মগ্লানি—অন্তর্যামী ছাড়া আর কারো জানা সম্ভব নয়। তার ওই অপমানজনক প্রস্তাবের উত্তরে মাস্টার মশাইয়ের চোখে-মুখে যে প্রসন্ন সুন্দর ক্ষমা, যে উদার বাৎসল্য-স্নেহের নির্ভুল পবিত্রতা,—সেটি তার এই উৎপীড়িত জীবনের পক্ষে যেমনি স্মৃতিস্বরূপ, তেমনি সান্ত্বনা। ধিক্কার তার নিজের জীবনে, ধিক্কার তার বিবাহে, তার কপালের সিন্দূরে, তার এই অপমানিত দিনযাত্রায়। সুখ এবং সম্পদের অসহনীয় নরকে মাধুর মন যেন কিলবিল করতে লাগলো।

হঠাৎ তার চোখ পড়লো শশীর দিকে। তার আনাগোনার ভাবভঙ্গী কেমন যেন সংশয়াচ্ছন্ন, যেন অত্যন্ত উৎকর্ণ। মাধু ডেকে বললে, শশী, কি খুঁজছো বলো ত?

শশী বললে, খুঁজছি? কই না! আমি বাড়িটা দেখে বেড়াচ্ছিলুম,—কত যে বড়···কুলকিনেরা নেই!

মাধু বললে, শশী, আমিও গরিব-গেরস্তর মেয়ে। নিজের জন্যে ঝি রাখার অভ্যাস আমার নেই। তোমাকে কাজের জন্যে রাখলুম, কিন্তু কাজ কোথায়? কী কাজ তোমাকে দেবো? তুমি এখানে থাকো, বরাবর থাকো, এই আমি চাই।

শশী বললে, আপনাদের কদ্দিন বিয়ে হয়েছে ?

এই ক'মাস হোলো।

আপনার মনে ত আনন্দ নেই ?

মাধু তার দিকে তাকালো। বললে, আনন্দ! বিয়ে হয় সুখের জন্যে। সুখ আমি পেয়েছি। এ বাড়ি সুখে ভরা।

শশী বললে, আপনার স্বামীকে আমি দেখেছি।

কেমন করে ?

আর একদিন যে এসেছিলুম মাস্টার মশায়ের সঙ্গে। বাইরে আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম। সেদিন আপনার স্বামী মাস্টার মশাইকে কড়া কথা বলে সরিয়ে দিলেন। আমি সেদিন—

শশী থেমে গেল। মাধু বললে, তবে তুমি আবার এলে কেন ?

শশী একটু থতিয়ে বললে, মেয়েমানুষ ত অপমান গায়ে মাখে না!

মাধু কিয়ৎক্ষণ অবাক হয়ে রইলো তার দিকে চেয়ে। পরে বললে, তোমার স্বামী কি করে ?

ঠিক জানিনে। তিনি থাকেন না।

কোথায় থাকে ?

তাও জানিনে। একদিন চলে গেছে, আর ফেরেনি।

মাধু বললে, তোমাকে এমনি করে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গেছে ?

শশী বললে, ভালো না লাগলেই ওরা চলে যায় দিদি। যাবার সময় ওরা পা দিয়ে মাড়িয়ে যায়। মেয়েমানুষের দামই এই।

মাধুর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠলো। লেখাপড়ার দাম কতটুকু? কতটুকু দাম সংস্কৃতির? ভদ্র মন, শোভন আচরণ, চরিত্রের শীলতা, স্বভাবের মাধুর্য,—এগুলো সোনার অলঙ্কারেরই নামান্তর। এদের মূল্য কতটুকু? আসলে পরম্পরাগতভাবে তারা মেয়েমানুষ, তারা ক্রীড়নক, তারা সুস্বাদ মাংসপিণ্ড—লালসার জারক রসে মাখা সুভোজ্য! আর কিছু কি?

হঠাৎ হেসে মাধু প্রশ্ন করলো, তোমার কতদিন বিয়ে হয়েছে, শশী?

শশী বললে, প্রায় একুশ-বাইশ বছর হোলো।

তুমি কি বলছো পৃথিবীতে কোনো স্বামীই ভালো ব্যবহার করে না?

করে বৈ কি!—শশী বললে, কপাল যাদের ভালো তাদের মাথায় করে রাখে।

মাধু বললে, তুমি ত চমৎকার কথা বলতে পারো, শশী!

শশী একটু হাসলো। বললে, ওরা কাছে রাখে না দিদি। ওরা—হয় মাথায় রাখে, নয় ত পায়ের নীচে।

কিন্তু যারা শিক্ষিত পুরুষ?

পুরুষরা ত পুরুষেরই কাছে শিক্ষা পায়, দিদি! ওদের শিক্ষাই আলাদা।

মাধু তার কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, শশী, আমাকে তুমি ক্ষমা করো। তোমাকে নিতান্তই ঝি বলে মনে করেছিলুম, কিন্তু তোমার কাছে তেমনিই আমি ছোট হয়েছি। সংসারে

তুমি অনেক দেখেছো। আচ্ছা, তুমি-যে মেয়েটিকে রেখে এলে তাকে দেখবে কে?

শশী বললে, মাস্টার মশাই থাকেন আমাদের বস্তির ধারেই। তিনি খোঁজ নেবেন বলেছেন।

তাকে খাওয়াবে কে?

সে চেয়ে খেতে জানে।

বয়স কত তার?

বছর তেরো।

মাধু তীব্র কণ্ঠে বললে, যে-স্বামী এতবড় অবিচার করে যায়, তার জন্যে মাথায় সিঁদুর তুমি পরো কেন, শশী?

শশী বললে, সিঁদুর মাথায় ছিল না, এখানে আসবার সময় পরে এসেছি। এই শাঁখা দু'গাছাও ধার করা।

মাধু তাড়াতাড়ি নিজের হাত থেকে কয়েক গাছা সোনার চুড়ি খুলে শশীর হাতে জোর করে পরিয়ে দিল। বললে, এ চুড়ি আমার স্বামীর দেওয়া নয়, মায়ের কাছে পাওয়া। এ তোমায় নিতেই হবে।

শশী বললে, বাসন মেজে আর সাবান কেচে হাত ক্ষয়ে গেছে, জল ঘেঁটে হাতে পায়ে হাজা,—এ শরীরে কি সোনার গয়না মানায়?

মাধু বললে, শালগ্রাম হোলো ছোট্ট পাথরের নুড়ি, তারই গলায় লোকে সোনার পৈতে পরায় ভাই!

শশী বললে, তোমার স্বামী কি মনে করবেন?

কিছু না। মাসে দু'তিনটে করে নতুন নতুন গয়না পাই, তিনি বড় নতুনের ভক্ত।

শশী সহাস্যে বললে, কিন্তু বউ কি থাকবে নতুন চিরদিন ? যে-মানুষটা কেবলই নতুন চায়, সে বড় হালকা।

মাধু বললে, তুমি জানলে কেমন করে ?

পুরনো হয়ে গেছি, তাই ত জানি, দিদি ! পুরনো বউ হোলো বস্তাপচা, তার ওপর গরিবের মেয়ে। রূপ নেই, দেহ নেই, বয়েস মরে গেছে—সেই বউয়ের দাম কি ?—শশী বলতে লাগলো, এর ওপর স্বামী যদি হয় হঠাৎ-বড়লোক, তবে সোনায় সোহাগা। মন পড়ে অন্য দিকে,—গরিবের মেয়ে তখন পথের ধারে পড়ে কাঁদতে থাকে। পুরনো বউ আর পুরনো কাহিনী—এ-দুটো এড়িয়ে লোকটা বনেদী সমাজের দিকে ছোটে।

নিজের ভবিষ্যৎ কল্পনা করে মাধু বললে, একি সকলের ভাগ্যেই হয়, শশী ?

শশী বললে, আমার হয়েছে, তোমারও হতে পারে !

কম্পিত রুদ্ধকণ্ঠে মাধু বললে, আমার সন্দেহ বাড়াও কেন, শশী ?

শশী বললে, তোমার চেহারার সঙ্গে আদরও কমবে, একি তুমি বুঝতে পারো না, ভাই ?

তোমার আমার কি একই ভাগ্য ?

একেবারে এক, একটুও তফাৎ নেই।

অধীর কণ্ঠে মাধু বললে, কি করে জানলে তুমি? তুমি কি চেনো আমার স্বামীকে?

শশী বললে, খুব—খুব চিনি—তার হাড়-পাঁজরা-রক্ত-মাংস সব চিনি। এই সব যা কিছু পেয়েছ, কিচ্ছু তোমার নয়, বোন। রস টেনে নেবে চিবিয়ে, তার পর ছিবড়ে ফেলে দেবে জঞ্জালে।

তোমার স্বামী অনাচারী, তাই বলে সব পুরুষই কি মন্দ, শশী?

শশী খুব হেসে উঠলো, পিশাচীর মতো তার মুখের কুঞ্চনে আর চোখের কোলে কত যে ভগ্ন জীবনের কাহিনী লেখা! মাধু ভীত হয়ে তার দিকে তাকালো। শশী আবার সশব্দে হাসলো—তার হাসির চূর্ণাংশ দোতলার নির্জন কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে বিদ্রূপের মতো প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

রুদ্ধশ্বাসে মাধু বললে, আমি একলা ছিলুম, ভয় ছিল না। তুমি যেন এলে কবরের মাটির তলা থেকে উঠে। শশী, তুমি ভাই কালই চলে যেয়ো।

কেন?

আমি একলাই থাকতে চাই।

আমিও যে থাকতে এলুম, বোন!

না, না—তোমার থেকে কাজ নেই। উনি এসে পড়বেন, ওঁর মেজাজ ভালো নয়। তুমি কাল সকালেই চলে যেয়ো!

হাসিমুখে শশী বললে, যদি না যাই?

ফস করে মাধু রুক্ষ হয়ে উঠলো, তার মানে? তোমাকে রাখবে কে? কোন্ অধিকারে থাকবে তুমি?

শশী শান্তকণ্ঠে বললে, তোমারই বা অধিকার কতটুকু, বোন?

মাধু চেঁচিয়ে উঠলো। বললে, এখনি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও তুমি!

শশী মুখ তুলে বললে, এ বাড়ি তোমারও নয়, আমারও নয়। এ হোলো এক জানোয়ারের গুহা—সে তোমার-আমার পোষমানা নয়!

দারোয়ান! রতন! তেজসিং!—বলতে বলতে উর্ধ্বশ্বাসে মাধু ছুটতে গেল, কিন্তু শশী তাকে তখনই জাপটে ধরলো। মাধু ছাড়াতে গেল, কিন্তু ততক্ষণে শশী তাকে সাপের মতো জড়িয়ে ধরেছে। অমনি করে জড়িয়ে শশী তার কানে কানে বললে, মেয়েমানুষের মান রাখতে শেখোনি, কেমনধারা লেখাপড়া-জানা মেয়ে তুমি?

বিরাট অট্টালিকার কোনোখান থেকেই চাকর-দারোয়ানের সাড়া এলো না। শশী মাধুকে ধরে অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে গেল।

শয়নকক্ষে ফিকে সবুজ আলো জ্বলছে। আলোটা প্রায় আবছায়া অন্ধকারে ঢাকা। ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে না আলোটায়।

মাধু জোর করে শশীকে বিছানায় শোয়ালো। বললে,

অনেক গল্প করেছো। ঘুমে তোমার চোখ জড়িয়ে এসেছে। এবার শোও দিকি!

শশীর সত্যিই তন্দ্রা এসেছিল। বললে, ভালো খাওয়া খেলুম অনেক দিন পর। তোমার এত যত্ন ভুলতে পারবো না। তুমি শোবে না?

ওই ত জায়গা রইল তোমার পাশে। কাজ সেরে এসে শোবো। আমি মশারি ফেলে দিয়ে যাই।

মাধু অল্পগতি পাখা খুলে দিল।

মশারি ফেলে দিল তার পরে। একবারটি দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলো, শশী অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছে। সে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে।

অনেক কাল সে জ্যোৎস্নার তলায় এসে দাঁড়ায়নি। আজ বোধ হয় শুক্লা সপ্তমী। আকাশলোক অনেকটা শূন্য, তার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ অপেক্ষাও শূন্য। সঙ্গীহীন চন্দ্রের সঙ্গে আজ তার একটা বোঝাপড়া করার সময় এসেছে। কিছুক্ষণের জন্য একাকী দাঁড়িয়ে সে একটা কঠিন সঙ্কল্প গ্রহণ করবে, দুর্ভাগ্যক্রমে এমন সময় সে পেলো না। সহসা নীচের তলায় স্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল— সে আওয়াজ তার কৃষ্ণকায় কুরূপ স্বামীরই। বোঝা গেল, হঠাৎ কালীপদ ফিরেছে আজই রাত্রে—রাত্রি এখন হয়তে বারোটাই হবে। সেই নাটকীয় মুহূর্তে মাধু কী করবে বুঝতে না পেরে অলিন্দের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়ালো। বুকের

মধ্যে তার ধক্ ধক্ করে একরকম শব্দ হচ্ছে—শব্দটাকে সে চাপা দিতে লাগলো দুই হাতে বুক চেপে।

কর্কশ কণ্ঠস্বরের মধ্যেই জানা গেল, কালীপদ বাইরে থেকেই আহারাদি সেরে এসেছে এবং মাদকের প্রভাব তার কণ্ঠে সুস্পষ্ট। এবার সোজা বিছানায় গিয়ে শোবে। মাধুর পা দু'খানা কাঁপুনিতে অস্থির হয়ে উঠলো।

শয়নকক্ষে প্রবেশ করে কালীপদ আস্তে আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। ফিকে সবুজ আলোর আবছায়া অন্ধকারে দেখতে পাওয়া যায়, মশারির মধ্যে ওপাশ ফিরে মাধু ঘুমিয়ে রয়েছে। সম্ভবত স্বামী-বিরহেই তার ঘনঘোর ঘুমটি স্বপ্নমধুর।

জামা-জুতো ছেড়ে গুনগুনিয়ে কালীপদ ডাকলো, মাধু, নতুন-বৌ ?

গভীর রাত্রের ঘুম অত সহজে ভাঙে না। কালীপদ সন্তর্পণে হাসিমুখে ঢুকলো অতি-পাতলা নেটের মশারির মধ্যে। তখন ওদিকের জানলার খড়খড়ির ফাঁকের বাইরে মাধুর একজোড়া কালো চোখ স্তব্ধ হয়ে রয়েছে।

মাদকের প্রভাবটা হোলো তামসিক। পিপাসার্ত কালীপদর চটুল প্রকৃতির তাড়নায় সহসা একসময় কেউটে সাপের তন্দ্রার ঘোর ছুটে গেল। শশী জেগে উঠে বসলো। বজ্রাহত কালীপদ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, কে, কে তুমি ? তুমি—তুমি কে ?

শশী ঘৃণার হাসি হেসে বললে, তোমার প্রথম স্ত্রী। বড্ড চম্‌কে উঠেছ, না?

কালীপদ প্রচণ্ড কোলাহলের সঙ্গে চেঁচিয়ে লাফিয়ে উঠলো।—কই, কোথায় সে? নতুন-বৌ?······রতন?······ তেজসিং···?

মশারি থেকে বেরিয়ে শশী বস্তির অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে বললে, মনে করেছিলে তোমায় খুঁজে পাবো না—তুমি নাম ভাঁড়িয়ে পালিয়ে বেড়াবে। চোর, বদমাইস, বেজন্মা!

খুন করবো—খুন করবো আজ নতুন-বৌকে!—কালীপদ পাগলের মতো বেরোলো ঘর থেকে। দারোয়ান, চাকর ইত্যাদি ছুটে উঠে এলো দোতলায়।

শশী এবার হাসতে লাগলো—অজস্র অফুরন্ত হাসি তার। ক্রমে তার সেই হাসি উচ্চ হতে উচ্চতর গ্রামে উঠে সেই বিশাল অট্টালিকাকে মুখর করে তুললো।

কালীপদ দাপাদাপি করতে লাগলো দোতলায়। চাকর-দারোয়ান বিমূঢ়, বিস্ময়াহত।

কিন্তু তার অনেক আগেই মাধু ভিন্ন পথ দিয়ে নীচে নেমে গেছে তার গায়ের গহনা খুলতে খুলতে। বাঁধন খুলতে পারলে আজকের দিনে অসীম মুক্তি! না, পরিচিত কোথাও সে যাবে না, ও-লোকটা যেন কোনোদিন তাকে খুঁজে না পায়। সে যাবে অপরিচয়ের দিকে, যেদিকে গেলে মেয়েদের এতকালের হারানো আত্মমর্যাদা খুঁজে পাওয়া যাবে।

বিরাটতর জীবন, বিপুলতর প্রাণ—তারই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে বুক ভেঙে রক্তক্ষরণ হোক, চোখ ফেটে ঝরুক জল, হোক ঘর্মাক্ত কলেবর।

সমস্ত অলঙ্কার মাধু খুলে ফেলে দিল, আঁচল দিয়ে ঘষে সিঁদুর মুছলো, তারপর অন্ধকারে খুট্ করে দরজাটি খুলে সে পথে নেমে হনহন করে চললো। না, বিয়ে তার হয়নি—একথা সত্য, কায়মনোবাক্যে!

— শেষ —